প্রকাশক :
শ্রীসুধাংশুশেখর দে
দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,
কলিকাতা ৭০০০৭৩

প্রচ্ছদ :
গৌতম রায়

মুদ্রাকর :
শ্রীকমল মিত্র
নবমুদ্রন
১ বি, রাজা লেন
কলিকাতা ৭০০০০৯

আমার অধিকাংশ গল্প যিনি উৎসাহে ছাপিয়েছিলেন, এবং নিয়মিত লেখকদের একজন ক'রে নিয়েছিলেন সেই শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক

রমাপদ চৌধুরীকে

[রচনাকাল—১৯৬৫-১৯৭৩]

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

দীর্ঘশ্বাস মঞ্চে স্মৃতিময়

মধ্যাহ্নের ব্যাধ

কাফের

বর্মের আড়ালে একা

বন্ধুবরেষু [যন্ত্রস্থ]

কাব্য-সংকলন গ্রন্থ

স্বনির্বাচিত

বাংলার মুখ

কালের কবিতা

প্রেম : অপ্রেম [যন্ত্রস্থ]

প্রসঙ্গত

গল্প সংকলনের অধিকাংশ গল্পই রবিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকায়, সাপ্তাহিক অমৃত ছাড়া দেশ, কৃত্তিবাস, যুগান্তর প্রমুখ বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় মুদ্রিত। বেশ কয়েকটি গল্প বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত। তারপর সাময়িক অনুপস্থিতি। ইদানীং, খ্যাতিমান সমকালীন সাহিত্যিক-বন্ধুরা, প্রিয় অগ্রজ ও প্রকৃত বোদ্ধা-অনুরাগীরা অভিমান ছেড়ে নতুন লেখার কথা ভাবতে বললেন, এবং বড় মাপের লেখার ডাক আসতে শুরু করলো, তখনই মনে পড়লো পুরনো ফাইলটার কথা। যত গল্প প্রকাশ হয়েছে, সব ছাপা হ'লে গ্রন্থটি বিপুলাকার হ'য়ে যেত, তাই নির্বাচিত--কিছু।

ঃ এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলা দরকার।

গল্পগুলির রচনাকাল আনুমানিক আরো একটি দুঃখের একটি দুঃখের ব্যাপার, আমার বহু বিতর্কিত গল্প 'কমণ্ডলু' যা 'দেশে' প্রকাশিত হয়েছিল, সেইটি ঠিক এ মুহূর্তে কাছে পেলাম না, বইমেলা উপলক্ষ্যে দ্রুত পাণ্ডুলিপি তৈরী করা ও প্রেসের ব্যস্ততায় সময়াভাবে উদ্ধার করা গেল না। গদ্য ও কবিতা নিয়ে বিভিন্ন জেলায় ও প্রদেশে আমাদের ছিল বিশাল পরিক্রমা। সেই সময়েই 'গল্পচক্র' থেকে শুরু ক'রে বিভিন্ন সভায় গল্প পাঠের বিশেষভাবে আমন্ত্রিত এই লেখক। তখনকার আলোচিত গল্পগুলো এখন কেমন লাগবে সেটাই বিচার্য বিষয়।

বরাবরই এলোমেলো আমি। ফাইলবন্দী ক'রে যতটুকু রাখতে পেরেছিলুম তাই-ই গভীর যমত্নে, শ্রদ্ধায় এবং অত্যন্ত আগ্রহে প্রকাশনার দায়িত্ব নিয়েছেন দে'জ পাবলিশিং।

এই সঙ্গে আমি আরেকজনের কাছেও কৃতজ্ঞ যার অহরহ তাগিদ, রাগ এবং সহযোগিতা ছাড়া এ সংকলনের পাণ্ডুলিপি প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না। সাহিত্যিক-শিল্পী গৌতম রায় অত্যন্ত মানসিক বিপর্যয়ের মুহূর্তের মধ্যে থেকে'ও সব কাজ ফেলে বন্ধুর দ্রুত কভার ক'রে দিয়েছেন, এরা এত কাছের যে, ধন্যবাদ জানাবার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

পাঠকের কথাই শেষ কথা।

শীর্ষস্থানীয় সম্পাদকের বিচারে প্রকাশিত হয়েছে বলেই লেখক হিসেবে একটু আশা থেকে যায়। মুদ্রণের সময়ে কিছুদিন কবিতার ডামাডোল, তারপর কলকাতার বাইরে চলে যাওয়া এবং মেলায় দ্রুত প্রকাশ করতে গিয়ে যথেষ্ট ভুল-ভ্রান্তি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। এ রকম ত্রুটি চোখে পড়লে সহৃদয়তায় ক্ষমা করবেন।

কলকাতা বইমেলা
ফেব্রুয়ারী

শান্তনু দাস

সূচীপত্র

টেবিল ল্যাম্পের প্রয়োজন ছিল, হয়তো ছিল আজ আর নেই

টেবিল ল্যাম্প

রোজ ঠিক এমনিভাবেই যায়।

বিকেল হতে না হতেই অফিসের চেয়ারগুলো ফাঁকা হতে থাকে। আর নিরাপদ যখন বেরোয় তখন প্রায় একেবারেই ফাঁকা। নিরাপদ ধীরে-সুস্থে টেবিলের ওপর জমে থাকা ফাইলপত্তর গুছিয়ে চৌকোনো পিসবোর্ড-ঢাকা হলদে-ছোপ গেলাসের বাকী জলটুকু একচুমুকে শেষ করে ড্রয়ারে চাবি দিয়ে সিঁড়ি ভেঙে নীচে নামে। তারপর সিধে লালবাজার ধ'রে হাঁটতে হাঁটতে বউবাজার হয়ে শেয়ালদা। এ সময়ে বাসট্রামের ঠাসা ভিড় এড়াবার জন্যে অনেকেই এ পথটুকু হেঁটে মেরে দেয়। নিরাপদও হাঁটে। হাঁটে বললে ভুল হবে, হাঁটতে বাধ্য হয়। অফিস-কাছারিফেরতা বাবুদের জন্যে এসময়ে বাজার,—ফুটপাত থেকে উপচে পড়ে রাস্তায়। নিরাপদ ঘুরে ঘুরে সস্তার সব্জি কিনে কাঁধে ঝোলানো সাইড ব্যাগ থেকে ছোট কাপড়ের থলেটা বার করে। দু একটা নয়, চার চারটে মুখ। নিরাপদকে হিসেব ক'রে চলতে হয়। বাজারে ঢুকলে সাইড ব্যাগের বইটা এবার দোলে। নিরাপদর কাছে চলে আসে।

নিরাপদর ওই একটা দোষ। বই পড়া। সদ্য কলেজ থেকে বেরিয়ে ঝকঝকে সরকারী চাকরীর প্রথম অবস্থায় নিরাপদ প্রায়ই বই কিনতো। তারপর নতুন মলাট থেকে কলেজ ষ্ট্রীট ঘুরে ঘুরে নামীদামী পুরনো বই। সে এক তীব্র নেশা। এখন আর নিরাপদ পারে না। এখন ওই অফিস-লাইব্রেরীতে এসে ঠেকেছে। নিজের কার্ড ছাড়া আরো দু-এক-জনের কার্ড চেয়েচিন্তে নিজের কাছে এনে রেখেছে। এতে সপ্তাহের খোরাকটা হয়ে যায়। এ যেন একটা অসুখ। কলেজ থেকেই এ অসুখটা নিরাপদ সঙ্গে করে এনেছে। আরোতো রোগ ছিল, যেমন—কবিতা গল্প লেখার ঘোড়া-রোগ, তা যখন নিরাপদ সাড়াতে পেরেছে, তখন এটাকেও সারিয়ে নেয়া চলতো কিন্তু এটা আর এখন সারার

নয়, এখন রোগটা ক্রনিকে এসে দাঁড়িয়েছে। শেয়ালদা থেকে নিরাপদ আবার হাঁটে। হাঁটতে হাঁটতে সেই ট্যাংরা। পথটা অবশ্য একটু বেশী কিন্তু নিরাপদর খুব একটা খারাপ লাগে না। নিরাপদ যখন বাড়ি পৌঁছোয় তখন গ্রাম গ্রাম এই এলাকাটা প্রায় নিঝুম। মালতী নিরাপদর খাবার ঢাকা দিয়ে শুয়ে পড়ে। নিরাপদ যখন ঘরে ঢোকে তখন এজমালী উঠোনের চারপাশ ঘেরা প্রায় সবগুলো ঘরের দরজা বন্ধ। এরই একটাতে থাকে নি াপদ, সামনে ঘেরা এক চিলতে বারান্দাটাকে দরমা দিয়ে আড়াল কে রান্নাঘর করে নিয়েছে মালতী। রান্নাঘরের এককোণে নিরাপদ আলতো করে বাজারের থলিটাকে নামিয়ে রাখে। ক্লান্তিটা যেন পিঠের ওপর ভর করে বসে থাকে। এ সময়ে একটু চা হলে খুব ভালো হোতো, একথা ভাবতে অবশ্য ভালো লাগে, কিন্তু এটা যে কোনদিনও হবার নয় সে নিরাপদ জানে। ঘরে অবশ্য একটা 'জনতা' আছে এবং তাতে আছে মহার্ঘ কেরোসিন, চা চিনি যে একেবারেই নেই তাও নয়, কিন্তু এ সময়ে তেল, চিনি খরচা করে চা খাওয়ার বিলাসিতা নিরাপদদের মানায় না। নিরাপদ চোখে মুখে পায়ে জলের আঁজলা দিয়ে ঘরে ঢুকে কোনার টেবিলটার ওপরে পেন, বইটা রাখে, জামাটা চেয়ারের গায়ে ঝোলে। ঘরের মাঝখানে একটাই আলো, সিলিঙের ওপর থেকে তার বেয়ে ওপর থেকে মাঝখানে এসে আটকে রয়েছে, ঠিক অফিসের মতো। ওটা যে কবে থেকে ঝুলছে নিরাপদর এখন আর মনে পড়ে না। ওখান থেকে এ কোণে যা আলো আসে, তাতে অবশ্য অক্ষরগুলো ঠাহর করা যায়, পড়া যায় না। নিরাপদ টেবিলের ওপর প্রায় উবু হয়ে ঝোঁকে। অসুবিধে হয়, তবু পড়ে। পড়তে পড়তে এখন অভ্যেস হয়ে গেছে। জীবনের অনেক অসুবিধেইতো কখন আমাদের অভ্যেসে এসে দাঁড়িয়ে যায়। নিরাপদ তবু ভাবে, ভাবতে ভালো লাগে—তবু একটা টেবিলল্যাম্প হলে খুব ভালো হ'তো। টেবিলল্যাম্পটা একসময় স্বপ্ন হয়ে আসে।

টেবিলটা এককালে টেবিলই ছিল। বাবার আমলের। শক্ত-পোক্ত বলে এখনো টিকে বসে আছে, তবে এটা আর এখন টেবিল নেই, এটা এখন তাক হয়ে গেছে। মালতীর এটা না হলে এখন চলে না।

গরম দুধের বাটি, মালতীর শায়া-সাড়ি, ছেলে মেয়েদের জামা, ওষুধের শিশি, স্কুলের খাতা বই, বাসিরুটির বাটি, মানে গোটা সংসার সামলে টেবিলটা নিরাপদকে এখন আর জায়গা দিতে পারে না। জায়গাটা ছোট হতে হতে এখন হাতখানেক হ'য়ে এসেছে। নিরাপদর কাছে তাই এখন অনেক। মালতীর আর কি দোষ, ঘরেতো ঐ একটা তক্তপোষ, তার তলায় পুরনো তোরঙ্গ থেকে বিয়ের ঘড়া, কি নেই, মেঝেতে নিরাপদ শোয়, সকালে বিছানাটা গুটিয়ে চলে আসে তক্তপোষের তলায়। পড়তে পড়তে একটু রাত হয়ে যায়। মালতী দু তিনবার আলো নেভাবার তাগিদ দিয়ে একসময় অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ে। নিরাপদ একটা টেবিলল্যাম্পের কথা ভাবে। টেবিলল্যাম্পটা স্বপ্ন হয়, স্বপ্নটা টেবিলল্যাম্প হয়ে আলো দেয়। নিরাপদ তাকে টেবিলের এক কোণে এনে বসায়, তার গা দিয়ে আলো ঠিকরে পড়ে। টেবিল আর ল্যাম্প মিলেমিশে নিরাপদ হয়ে যায়। এবং একসময় তারা মিলিয়ে যায়।

নিরাপদ মেঝেতে রাখা এ্যালুমিনিয়ামের ঢাকাটা তুলে ঘোরানো ফেরানো সেই এক তরকারী দিয়ে রুটির পাটিসাপটা করে দাঁতে ছিঁড়ে চিবুতে চিবুতে মালতীকে শুধোয়—শুনছো,

ঃ উঁ

—রুটিগুলো চামড়া হয়েছে, কে করেছে গো ?

ঃ কে আবার করবে, আমি। ঘুমের ঘোরেই উত্তর দিয়ে যায় মালতী।—ও। নিরাপদ আবার চিবুতে থাকে। নিরাপদ জানে আশেপাশের ঘরের অনেক মেয়ে বউরা মালতীর সঙ্গে গল্প করতে আসে, কিন্তু তারা আর যাই করুক, খামোকা রোজ রোজ রুটি করতে যাবে কেন। নিরাপদ জানে, তবু জিজ্ঞেস করে। ওই অভ্যেস। মালতীরও উত্তর দিতে দিতে অভ্যেস হয়ে গেছে। আজকাল ঘুমের ঘোরেও জবাব দিতে ওর একটুও ভুল হয় না। যেমন নিরাপদ রোজ টেবিল-ল্যাম্পের ভাবনা ভাবে।

এই হোলো নিরাপদর দিন রাত।

রোজ ঠিক এমনি ভাবেই যায়।

আজও যেতো। কিন্তু সেদিন···। সেদিন মাসের শেষে অফিসে একটা বিপ্লব ঘটে গেল। ছাব্বিশ তারিখে পুলিন ট্রেজারী থেকে চেকটা ভাঙিয়ে কড়কড়ে নোটগুলো বড়বাবুর সামনে এনে রাখলো। দপ্তরী অরবিন্দ সবার কাছ থেকে রেভিনিউর পয়সাগুলো এক সাথে করে পোস্টঅফিসে দৌড়লো। মাসের শেষ ক'টাদিন সরকারী বাবুদের দশ নয়াও একটা পয়সা। তবে এদিনটার জন্যে প্রায় সবাই রেভিন্যুর পয়সা-গুলো আলাদা করে রেখে দিয়েছিলো। খগেনবাবু, দুলাল মুখার্জী বিল, টাকা রেজগী গুছিয়ে নিয়ে বসলো। টাকাটা যেন হঠাৎ ছপ্পড় ফুঁড়ে আসা। পড়ে-পাওয়া। একদিন একদিন করে কয়েকদিন স্ট্রাইকের কাটা মাইনে এই সরকার এসে কর্মচারীদের ফেরত দিচ্ছে। এসব টুকটাক পাওয়ার খবর বাড়িতে এসে পৌঁছোয়না, ফলে টেবিলে প্রতিমা, রীতা, আশা, শান্তনাদিরা শাড়ির গল্প জুড়ে দিল। নিরাপদ কক্ষনো এসব কথা শোনেনা, নিরাপদকে হিসেব করে চলতে হয়। তাছাড়া এক আধটা নয়, কড়কড়ে আশীটা টাকা। চাট্টিখানি কথা নয়। কিন্তু সেদিন যে কি হলো, ফুলকিটা কিভাবে বারুদে এসে পড়লো নিরাপদ জানে না।

মানুষটা যেন সেদিন হঠাৎ বিদ্রোহী হয়ে উঠলো। নিরাপদর যা ভাবতে নেই, তাই ভাবলো। যা করতে নেই, তা করবার প্রতিজ্ঞা করলো। আজ একটা টেবিলল্যাম্প কিনতে হবে। কিনতেই হবে—ভাবনাটা হৃৎপিণ্ডের তালে তালে বাজতে শুরু করলো।

অফিস থেকে ও একটু আগে বেরুলো, যা নিরাপদ করে না। বুক-পকেটটা হাত দিয়ে একবার দেখে নিল। বিড়ি খেতে খেতে মুখটা যেন হেজে গেছে। রাস্তাটা পেরিয়ে শিবলালের দোকান থেকে একটা মিঠেপাত্তির পান, আর একটা ফিল্টার সিগ্রেট কিনে জম্পেশ ক'রে একটা সুখটান দিল নিরাপদ। যেন কলকাতা শহরে নিরাপদ নামে একজনই পথ হাঁটছে, ফলে ডালহৌসি পাড়ার এই প্রায় জ্যাম জায়গাটা পার হতে গিয়ে ট্রামটা দাঁড়িয়ে পড়লো। যা ডিগগা যা ডিগ্‌গা করতে করতে তার পেছনে প্রাইভেট বাস। জানলা দিয়ে পাবলিক দুচারটে খিস্তি ছুঁড়ে দিল। নিরাপদর পরোয়া নেই, কারণ নিরাপদ জানে, ওদের পকেট ওর মতো নয়, ওরা তো রাগবেই।

নিরাপদ গোটা শহরটাকে ক্ষমা করে দিয়ে মুঠোর ফাঁকে সিগ্রেটটা কৃপণের মতো শেষ করতে লাগলো। ডালহৌসি থেকেই নিরাপদ বাঁক নিল ক্যানিং স্ট্রিটের দিকে। অজিত সরকারের সম্বন্ধির ওখানে একটা লাইটের দোকান আছে। ওকে সঙ্গে করে আনলে অবশ্যি ভালো হোতো, যাকগে নিরাপদও চেনে, না হয় একটু ছোটই হোলো।

বড় বাজার লেনে টেবিলল্যাম্পের দোকান মানে সারসার টেবিল-ল্যাম্পেরই দোকান। ছোট বড় নানা মাপের নানা শেড নিরাপদর চোখটা ধাঁধিয়ে দেয়। দোকানটা রাধাবাজারের এক কোণে খুঁজে পাওয়া গেল। বেশ দোকান করেছে অনিল। সরু হয়ে রাস্তা থেকে ভেতরে ঢুকে গেছে। দেয়ালের এপাশে ওপাশে মাথায় হরেকরকম আলো, কোনটা গ্যাসের বাতি, কোনটা বা স্প্রিং মোড়ানো। সে সব নানা বাহারী ব্যাপার। নিরাপদ ওদিকে একদম না গিয়ে শম্ভুর কানের কাছে মুখটা নিয়ে গিয়ে আলতো করে বললো—পুরনো স্টক কিছু আছে? শম্ভু অবাক হোলো—পুরনো মানে? মানে আপনি পুরনো মডেল চাইছেন?—না না, তা নয়, আমি বলছি পুরনো মাল যদি কিছু থাকে, ধরো বিক্রিটিক্রি হয়নি, কি হবেও না। ডিজাইনতো রোজ পাল্টাচ্ছো—সে দাদা অনেক হ্যাঁপা, গুদোমে খুঁজতে হবে। —দ্যাখো না ভাই, রিজেক্ট মাল কি আর দু একটা পাবে না। জামাইবাবুর কলিগ। শম্ভু একটু ভেবে বললো, আচ্ছা আপনি একটু বসুন, আমি দেখছি। নিরাপদ কৌটো থেকে একটা বিড়ি বের করে ঠুকে ঠুকে মুখে ধরাতে ধরাতে ভাবে টেবিলল্যাম্প একটা হোলেই হোলো, এর আবার নতুন পুরনো কি। দোকানের মাথার আড়ালের গুদোম থেকে ঝেড়েঝুড়ে একটা মাল নিয়ে এসে সামনে রাখতেই নিরাপদর বেশ পছন্দ হয়ে গেল। পুরনোতো নয়ই, বরঞ্চ ছিমছাম। মালটাও প্রায় অর্ধেক দামে পেয়ে গেল নিরাপদ। শম্ভু ঝেড়েঝুড়ে টেবিল ল্যাম্পটায় একটা ঝকঝকে আর্জেন্টা বাল্‌ব লাগিয়ে বোর্ডে প্লাগটা ঢোকাতেই জায়গাটায় আলো ঠিকরে পড়লো। টেবিলল্যাম্পের গা পেঁচিয়ে সবুজ তার, শম্ভু ছেঁড়া বাক্সটা পাল্টে ঝকঝকে নতুন একটা বাক্সে যত্ন করে ল্যাম্পটা ঢুকিয়ে দিল।

জীবনের সবচেয়ে প্রিয়তম জিনিষ আলগোছে সাইড-ব্যাগটায় ঢুকিয়ে কদম্‌ কদম পায়ে রাস্তায় নেমে এলো নিরাপদ। বুকের কলজেটা তেজী ঘোড়ার মতো ছুটছে। ছুটছে তো ছুটছেই, তাকে আর বাগ মানানো যাচ্ছে না। শেয়ালদার রাস্তার মোড় ঘোরবার আগে আরেকটা সিগ্রেট কিনলো নিরাপদ। মাছটাছ রোজ আর ক-টা বাড়িতে হয়। নিরাপদদেরতো হয়ই না। এসব ভালো ভালো জিনিষগুলো রোববারের জন্যে তোলা থাকে। অথচ এমন দিন ছিল যখন ছোট বড় যাহোক একটু আঁশের গন্ধ না হলে নিরাপদর খাওয়া হোতো না। সে সব দিনের কথা থাক। সামনে পৌষ সংক্রান্তি। মূলো আর খাওয়া যাবে না, নিরাপদ কয়েক জায়গা ঘুরে একটা তাগড়াই গোছের কচি মূলো কিনলো। মূলোর সঙ্গে হঠাৎ শোল-মাছের কথা মনে হোলো। আচ্ছা কাল শোলমূলো খেলে কেমন হয়? মায়ের আমলে এসব হোতো। মা-ই তাগাদা দিয়ে বাজার থেকে এসব আনাতো ; আজকাল সেটা স্মৃতিতে এসে দাঁড়িয়েছে। আজ সেইরকম একটা কিছু খেতে ইচ্ছে করলো নিরাপদর। ঠিকমতো জোগাড়যন্ত্র ক'রে দিলে মায়ের মতো অতটা না হোক, মালতী খুব একটা খারাপ করবে না। মাছের বাজারের দিকে এগুলো নিরাপদ, তিনপাক বাজার ঘুরে বেশ প্রমাণ সাইজের একটা মাছ কেনার মতো আরেকটা দুঃসাহসিক কাজ করে ফেললো নিরাপদ। সঙ্গে চার টাকা কিলোর কড়াইশুঁটির পাক্কা আড়াইশো। ভাবা যায় না। মাছের কানকোয় দড়ি বেঁধে, ব্যাগে মূলো কড়াইশুঁটি আলুর পাশে সাইড ব্যাগে টেবিল ল্যাম্পটা কায়দা করে বসিয়ে নিরাপদ বাড়ি চললো। একে যাওয়া বলে না, বলা যায় গমন। ফিরতে ফিরতে সেই রাত। গ্রাম গ্রাম নিঃঝুম। মালতী রোজকার মতো ঘুমিয়ে পড়েছে। বালতিতে জল দিয়ে মাছটা জিইয়ে রেখে তরকারীগুলো মেঝের পাশে গুছিয়ে, টেবিলল্যাম্পের বাক্সটা হাতে তুলে নিল নিরাপদ। একে কোথায় বসাবে নিরাপদ, জায়গাটাতো ছোট হতে হতে বুকের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, লেখার ডায়েরীটা, বইটইগুলোর ওপর চাপা পড়ে গেছে সংসার। ওখানেই বসিয়ে তারগুলো ছাড়িয়ে নিল নিরাপদ। হিটারের

জন্যে বোর্ডে একটা সকেট ছিল। ছিল? ছিল বোধ হয়। এখনোকি আছে? ভালো করে একবার দেখে নিল নিরাপদ। নাঃ, আছে, তবে ধূলোঝুলে ঢাকা। নিরাপদ ওটাকে একটু ঝেড়েঝুড়ে প্লাগটা বের করলো। প্রবল উত্তেজনায় নিরাপদ ভাবলো জ্বলবে তো? লাগবে কি লাগবে না ভাবতে ভাবতে শীতকালের সকালে মাথায় জল ঢালার মতো ছুম করে প্লাগটা বোর্ডে ঢুকিয়ে দিতেই ঝপাং করে একটা তীব্র আলো ঘরে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়তেই নিরাপদর চোখটা হঠাৎ বুজে এলো। চোখ খুলতেই আলো। এই ঘরে এত আলো একসঙ্গে নিরাপদ কখনো দেখেনি। আলোর জলে স্নান করতে করতে নিরাপদ কখন যেন ছেলেমানুষ হয়ে উঠলো। টেবিলল্যাম্পটা তুলে নিরাপদ এবার ফোকাসটা নিজের মুখে ফেললো।

নাঃ, এ চেহারা দেখা যায় না। ছিল না তা নয়, অন্তত কিছুদিন আগের চেহারাটাও যদি নিরাপদর থাকতো। নোনা-দেয়ালে টাঙানো হলদে হয়ে যাওয়া বিয়ের ছবিটার দিকে একবার তাকালো নিরাপদ। ও কোন নিরাপদ। ও কি এই নিরাপদ? টেবিলল্যাম্পটার মুখ ঘুরে যায়। নিরাপদ আলতো করে ফোকাসটা মালতীর দিকে ফেললো। মালতী ঘুমুচ্ছে ঠিক মরা মানুষের মতো। নিরাপদর দেখে কষ্ট হয়। এত খারাপ দেখতে হয়ে গেছে মালতী। কণ্ঠার হাড় চোখা হয়ে জেগে আছে, শিরা ওঠা চোয়াল। একি সেই মালতী। নিরাপদর কান্নাটা বুক ঠেলে গলায় এসে আটকে থাকে। মালতী ঘুমুচ্ছে। ঘুমুক। টেবিল-ল্যাম্পটা নিঃশব্দে সরে এসে ছেলেমেয়েদের শরীরে গিয়ে পড়ে। নিরাপদ হাসে। শিশুদের স্বাস্থ্য, সুষম আহার, নিউট্রেশন এসব কত বড় বড় কথা ও জানে নিরাপদ, ওকে রোজ এই নিয়ে কাজ করতে হয়। এসব কাদের জন্য, নিরাপদ জানে না শুধু দেখে ওরা কতো রোগা হয়ে গেছে। ওরা কি করে বাঁচবে? মালতী বুক দিয়ে ওদের কতটা আগলে রাখতে পারবে কে জানে। নিরাপদ সজোরে টেবিলল্যাম্পটার মুখ ঘুরিয়ে নিতে দেয়াল আলো হয়। নোনা ফ্যাকাশে যেন এক ভূতগ্রস্ত অনুভব। তক্তপোষের নীচে কালো অন্ধকার, নিরাপদ সরিয়ে নেয়। বারান্দার খোঁদলে

খোঁদলে শ্যাওলা তা ছুঁয়ে আলো ঘুরতে ঘুরতে আবার নিরাপদর মুখের সামনে এসে দাঁড়ায়, নিরাপদ তাকাতে পারে না, বাবলু নড়ে ওঠে? মালতী পাশ ফিরে শোয়। তক্তপোষটা উঁচু হয়ে ভেতরের আবর্জনাগুলোকে সামনে এনে দেয়। ঘরের দেঁতো হাসি, নোনা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। নিরাপদ ভয় পেয়ে টান মেরে প্লাগটা খুলে দিতেই এক ঝাঁক অন্ধকার বাদুড়ের ডানায় ভর ক'রে ঘরের ভেতর হুমড়ি খেয়ে পড়ে।

নিরাপদ ঝুল-ভুমটা আলগোছে জ্বেলে দেয়। আবার সেই অভ্যস্ত সংসার। নিরাপদর আলো নিরাপদ চিনতে পারে। এটাই এখন যেন বেশ মানিয়ে গেছে। একটা টেবিলল্যাম্পের ভীষণ প্রয়োজন ছিল। হয়তো ছিল. আজ আর নেই। আজ এ ঘরে নতুন কিছু আর মানায় না। এত আলোয় নিরাপদর আতুল জীবনটা বড়ো অচেনা বলে মনে হোলো।

বারান্দায় হঠাৎ ঢাকা মাছের ঝাপটানোর শব্দ।

টেবিলল্যাম্পটা কালকেই কাউকে দিয়ে দিতে হবে। তারগুলো গুটিয়ে রাখলো নিরাপদ।

ট্রফিটা আগেই দিয়ে দিলাম তরণীদা জিততে আপনাকে হবেহ।

বড়ো মানুষ

তরণী আছিস, তরণী ? তরণী আছো নাকি হে ?

একসঙ্গে অনেকগুলো গলা, পাড়ার এক কোণে ঝমঝমিয়ে উঠলো। শীতে ঘুমটা যেন বড্ডো জেঁকে বসেছিলো। আগের তিনটে রাত পাড়ার যাত্রার প্যাণ্ডেলে কাটাতে হয়েছে, অবিশ্যি যাত্রা দেখার জন্য নয়। বিকেল থেকে রাত অব্দি পার্টির ফাই-ফরমাস। বড়ো পার্টি তো—তাদের বায়নাক্কা কতো। তারপর আসর ভাঙার পর সতরঞ্চি ফরাশ মায় ডেকরেটরের চেয়ার সব কিছু গুছিয়ে গাছিয়ে রাখতে প্রায় রাত শেষ হবার মুখে। ক্লাবের সেক্রেটারী অনাদিদা বাড়ি যাবার আগে তরণীকে কড়া নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন। দেখো তরণী, তোমার ওপর সমস্ত ভার। তরণী কখনো কথার খেলাপ করে না সেটা প্রায় সব মেম্বাররাই জানে।

শুধু যাত্রা নয়।

পুজোতে রাত জেগে ঠাকুর সাজাবার টুকটাক কাজ করবে তরণী। ভাসানে ঘট মাথায় ডুব মেরে ফিরবে তরণী। অথচ তরণী যে ক্লাবের বিশেষ কোন পদ নিয়ে আছে, তা নয়। উল্টে স্যুভিনিয়ারে ওর নামটা ছাপতে অনেক সময় ভুল হয়ে যায়। তরণী অবশ্যি তাতে রাগ করে না। পেটা চেহারার শ্যামলা হরিণের মতো টানা টানা চোখে এক ঝাঁক মাথার চুল নাড়িয়ে ও হাসে।

তরণীদের সাবেকী একটা ছোট বাড়ীতে কয়েকঘর ভাড়াটে আছে, তাতে মোটামুটি মা আর ছেলের চলে যায়। আর তরণীর তো যাবেই, ওর তো সাত-পাঁচ নেশাভাঙ কিংবা উটকো ঝামেলা নেই ; এমন কি সিগ্রেটের ধোঁয়া পর্যন্ত ওর সহ্য হয় না, তবে ওকে বললে ও এনে দেয়। তাছাড়া পাড়ার বারোয়াড়ী পুজো-পার্বনে ঠাকুরঘরের পেছনে একটু রাতে যা চলে, সে জিনিস তরণী কখনো ছোঁয় না। তবে চায়ের দোকান

থেকে গেলাস-টেলাস জল কেটলি মায় চানাচুর পর্যন্ত ও অর্ডার অনুযায়ী সামনে এনে রাখে। *এসব একটু না চড়ালে রাত জাগা চলে ?* রাত অবশ্য ওরা জাগে না, জাগতে হয় তরণীকে। বন্ধুরা জানে তরণী বিশ্বাসী। তরণীকে সব কাজ বলা চলে, তরণীকে নিয়ে সব কাজ করিয়ে নেয়া যায়। আর জানে বলেই পাড়ায় শ্রাদ্ধে, বিয়ে, পৈতে, অন্নপ্রাশনে তরণীর ডাক পড়ে আর দশজনের মতো কার্ড দিয়ে নেমন্তন্ন করে নয়! আসলে জানতে জানতে সব্বাই জেনে ফেলেছে—তরণী ছাড়া কোন কাজ হবার নয়। বন্ধুরা ওকে বন্ধু বলে মনে করে না। আর শত্রু হবার কোনো যোগ্যতাই ওর নেই। ও যেন একটা কেমন। জমিয়ে আড্ডা পর্যন্ত মারা যায় না। ইডিয়েট। এমন কি পাড়ার সেদিনের মেয়েরা, মানে অপর্ণা, মায়া, খুকু, মলি, রিঙ্কুরা পর্যন্ত ওকে মানুষ বলে মনে করে না। পাগলাটার সামনে ওরা এমন সব রগড়ের কথা দুমদাম বলে ফেলে, যা শুনে ছেলেদের কান ঝাঁ ঝাঁ করে উঠবে। তরণীর হয় না। ও আবার একটা ছেলে নাকি? খালি চেহারাটাই করে রেখেছে কুঁদো পাথরের মতো। অপদার্থ! এই দলে কখনো সখনো শমিতা থাকে, কিন্তু হাসে না। ও ভাবে—মানুষটা যেন কি!

তরণী চাদরটা গায়ে জড়িয়েই ঘুমজড়ানো চোখে দরজা খুলে শুনলো—পল্টুর ঠাকুমা মারা গেছে। ওদের বাড়ীতে আর যাওয়া হয়ে উঠলো না। ওখান থেকেই সিধে জগুবাবুর বাজার। সেখান থেকে লোক জাগিয়ে খাট, ফুল, ধূপ, তোড়া সঙ্গে করে নিয়ে ঠিক টাইমে চলে এলো তরণী। কান্না ওর একেবারে সহ্য হয় না, তবু এক ঝাঁক কান্না মাথায় করে নিয়ে খাটের পায়ায় ঘাড় লাগিয়ে সবার সঙ্গে এগুলো তরণী। শীতটা যেন হাজারটা আলপিন হয়ে শরীরে ফুটছে।

এই শীতে কেউ স্নান করে না। গঙ্গাজল মাথায় ছিটোলেই হোলো। গুরুজনদের বিধান মেনে একসঙ্গে ফিরতে ফিরতে যে যার নিজের প্রবলেমের কথা বলতে বলতে এগুলো। সত্যি, এই

রাতে তরণীকে দিয়ে কেমন করে সব ম্যানেজ করা হোলো বলতে বলতে বন্ধুরা তরণী-ট্রফিটা সবাই ভাগ করে নিলো। তরুণীকে মনে হচ্ছে একটা চাষের বলদ। গুঁতো খেয়ে সারাদিন জমি চষে এখন ক্লান্ত পায়ে ঘরে ঢুকছে নিষ্পলক অনুভূতিহীন। ঠাকুমার ছুম করে মরে যাওয়ার জন্যে সবচেয়ে রাগ হচ্ছিলো পল্টুর—শালা মরার আর সময় পেলো না। মলির বিয়েটা নির্ঘাৎ পিছিয়ে যাবে। মাত্র সাত দিনের ছুটি ম্যানেজ করে কলকাতায় এসেছে। ছুটিটা না আবার একস্‌টেন্‌ড করতে হয়। পল্টুর গলাটা আলতো করে প্রায় সবার কানে গেল, কিন্তু কেউ থামতে বললো না, কারণ চাপা একটা বিরক্তি প্রায় সবার মনেই ঘুরঘুর করছে। এমন কি পল্টুর বাবারও।

বড়লোকের মড়া। সুতরাং রাত হলেও ভিড়টা খুব একটা কম হয়নি। শবযাত্রাটাকে বেশ একটা মিছিল মিছিল বলে মনে হচ্ছিলো। তরণী আনমনে হাঁটতে হাঁটতে কখন যেন একটু পেছিয়ে পড়ে ভাবছিল।

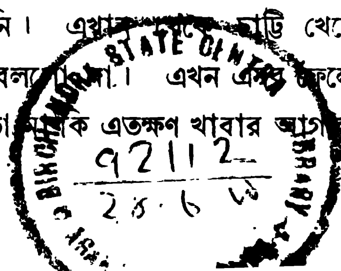
দোষ কাটাবার জন্যে সবাই আগেভাগে ছোলাগুড়, নিমপাতা, খড়ের আগুনের তাপ, জাঁতিটাঁতিছোয়ার পর আস্তে আস্তে ভিড় পাতলা হয়ে এলো। তরণী যখন এসে দাঁড়ালো, তখন আগুন নিভে গেছে, এমনকি নিমপাতা অব্দি ফাঁকা। তবে ঘরের কল্যাণ অকল্যাণ বলে একটা কথা আছে! তাই জ্যাঠাইমা পাশ থেকে বললেন—বাবা তরণী, লোহাটাকে অন্তত গায়ে ঠেকিয়ে নে। তরণী তাই ছুঁয়ে বাড়ির পথ ধরলো, আসবার সময় দরজা বোধ হয় ভালো করে বন্ধ করে দিয়ে আসা হয়নি। ততক্ষণে এ বাড়ীতে চা-সিঙাড়া জিলিপীর আয়োজন চলছে। তরণীর বাড়ীতে এখন অনেক কাজ। বাজার করা থেকে কাপড় কাচা, এমন কি রান্নাবান্নার টুকিটাকি। শীতে মাকে খাটতে দিতে কষ্ট হয়। এ সময়ে মায়ের হাঁপানির টানটা বাড়ে। তরণীর আর শরীর বইছে না। চোখের কোণ দুটো যেন জ্বালা জ্বালা করছে।

বিয়েটা একটু পিছিয়ে গেল বটে, তবে বেশী দিন নয় কারণ শাস্ত্রমতে বামুনকে কিছু ধরে দেওয়ার রেওয়াজটা এখনো চালু আছে। সুতরাং নিয়মমাফিক আয়োজন শুরু হয়ে গেল। মলি, পল্টুদের হাতে লেখা

ছোট কার্ড থেকে বড় বাড়ীর ঝকঝকে বাহারী কার্ডগুলো পাড়ার চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। কোনোতরফ থেকেই তরণীদের বাড়ীতে একটা কার্ড এসে পৌঁছুলো না। এবারে কিন্তু ও খুব আশা করেছিলো ওর মায়ের নামে নিশ্চয়ই একটা কার্ড লেখা হবে। যাক্‌গে, তরণী তো ঘরের ছেলে, ও এই ভেবেই খুশি হয়। যা বড়ো বাড়ির বিয়ে, তাতে নানা তালগোলে হয়তো ভুল হয়ে গেছে। বিয়ের দু'দিন আগে পল্টুকে দিয়ে ডেকে পাঠিয়ে জেঠিমা বললেন—বাবা তরণী, এ তো তোমার ঘরেরই কাজ, বোনটাকে উদ্ধার করে দাও বাবা। তরণী বিনয়ে মাথা হেলালো, অর্থাৎ পার করার দায়িত্বটা ও নিল।

এ বাড়িতে অনেক কাজ হয়েছে। সব কাজই করে নিতাই ঠাকুর। তাকে বুক করাই ছিলো, তবু আগের দিন ঠাকুর যোগাড়েকে ধরে এনে দুপুর থেকেই ছাতে উনুন পাতিয়ে ভেয়ানের কাজ শুরু করে দিল তরণী। সারারাত ধরে চলবে মিষ্টির পর্ব। বিয়ে বাড়ি জমে উঠেছে। ছুটোছুটি করে কেউ খানিক মিষ্টির কড়াই ঘুরে দুড়দাড়িয়ে আবার নীচে নেমে গেল। কর্তাগোছের কেউ কেউ খানিকটা তদন্তের ভঙ্গী করে আবার ধীরপায়ে তলায় নেমে শোবার ব্যবস্থা করতে গেলেন। খাওয়াদাওয়া সেরে কে যে কোথায় টুকটাক মিলিয়ে গেল বোঝা গেল না। পায়ে পায়ে রাত বাড়ছে। নিস্তব্ধ বাড়ির এ-ঘর সে-ঘর থেকে টুকরোটাকরা কথা, মস্করা, হাসির ছড়রা হঠাৎ হঠাৎ লাফিয়ে ছাতে ছুটে আসছে। পল্টুর বাবা, মানে—বড়কর্তা, শুতে যাবার আগে তরণীকে কাছে টেনে এনে প্রায় কানে কানে বলে গেলেন—একটু সজাগ থেকো হে, মিষ্টিটিষ্টির ব্যাপারে কারিগরদের একদম বিশ্বাস করতে নেই, চাবিটা ধরো। ওদের দিয়ে সব কিছু ভাঁড়ারে তুলে, চাবি তোমার জিম্মায় রেখো।

পেটের কোণা থেকে একটা চিনচিনে ব্যাথা উঠে আসছে। তরণীর একটা বাজে অভ্যেস, ক্ষিদেটা সহ্য করতে পারে না। সারাদিন কাজের ঝামেলায় বাড়িতে যাওয়া হয়ে ওঠেনি। এখানে [illegible] দুটি খেয়ে নিলে হোতো, কিন্তু কেউতো এসে বললো না। এখন এসব ফেলে বাড়িতে যায়ই বা কি করে। তাছাড়া [illegible] এতক্ষণ খাবার আগলে



বসে আছে? বুড়ি মানুষ। যাক্‌গে, তরণী ভেয়ানের পাশে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে গা-টা এলিয়ে দিলো। উনুনের আঁপটা বড্ডো ভালো লাগছে। ঠাকুরেরা একমনে হাতায় নেড়ে লেডিকেনি রঙ করে যাচ্ছে।

ঠিক আছে মাসীমা, তরণীদাকে বরঞ্চ আমিই দেবো, এখন তো আমার আর বিশেষ কিছু করার নেই।

—ঠিক আছে মা, তুমি দ্যাকো, আমি বরঞ্চ নীচে যাই, দেখি কি আবার ওলোট-পালোট হয়ে আছে। শমিতা খুব গুছিয়ে পাতায় ভাত সাজিয়ে জিজ্ঞেস করলো—আপনার ক্ষিদে তেষ্টাও নেই তরণীদা?

—যা কাজের ঝামেলা, সময় করে উঠতে পারছি না।

কাজ? কার কাজ? কিসের কাজ? যার জন্যে সারাদিন আপনাকে উপোস করে থাকতে হবে? আর তো কেউ এভাবে নিজেকে এমন কাজের লোক বলে মনে করে না।—সত্যিই আপনি একটা পাগল। আপনি যে কি-না! তরণী হাসে। সেই শ্যামলা চোখে, এক হাসি।

শমিতাকে নিচে না পেয়ে বেশ কয়েকটা পাজামা পাঞ্জাবি পায়ে পায়ে ছাতে চলে আসতেই শমিতা এবার নিজেকে গুটিয়ে নেয়। হাড়হাবাতের মতো পাতের ভাতগুলো শেষ করে তরণী। খুব তাড়াতাড়ি। ওপরে ঝাড়ুদার চলে এসেছে। এক্ষুনি সারা বাড়ি ঝাঁট পড়বে।

সন্ধ্যে পড়তে না পড়তেই তরণী সেন আবার তরণী হয়ে উঠলো। বিয়ের সময় সন্ধ্যে, তার ওপর শীত। আলো কমতে না কমতেই সারা বাড়িটা আলোর মালা পরে ঝলমলিয়ে উঠলো। নাঃ, ডেকরেটার জব্বর সাজিয়েছে। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে সানাই। স্প্রে-মেশিনে গন্ধ-জল ছিটোচ্ছে বাহারী পোষাকের বন্ধুরা। জুঁইয়ের মালা, খসখসে বেনারসী, ঝমঝমে গয়নায় যেন বাড়িটাকেই চেনাই যাচ্ছে না। বিয়েবাড়িতে বোধ হয় সব্বাইকেই সুন্দর লাগে। মলির বন্ধুরা ঘর জাঁকিয়ে বসে আছে। বাড়ির কর্তাব্যক্তি আত্মীয়েরা গেটে দাঁড়িয়ে আছে বর আসার অপেক্ষায়। এতক্ষণ মনে হয়নি, এবার তরণীর

নিজের দিকে তাকিয়ে বড্ডো বেমানান মনে হলো। ভীষণ ময়লা আর শস্তার ছিট। যাক্‌গে। তরণী তো ভাঁড়ার ঘরেই থাকবে, এ ভারটা তো আর সবাইকে দেয়া যায় না। ওকে আর কে দেখবে। সবাইকে বাঁচিয়ে এক ফাঁকে চিলেকোঠায় উঠে গেল তরণী।

একে একে ইয়া বারকোস, কড়া, ডেকচী ক্রমশই খালি হয়ে যাচ্ছে দেখে তরণী বুঝলো এখন বাইরের নিমন্ত্রিতদের মধ্যে আর বিশেষ কেউ নেই। এই ছোট একটা দমবন্ধ ঘরে নানান রান্নার মাঝখানে তরণী এই শীতেও যেন ঘেমে উঠলো। জামা, প্যাণ্ট, গেঞ্জি সবই ভেজা ভেজা, মাথা গড়িয়ে ঘাম চোখে পড়তে বাঁ হাতের চেটোতে মুছে ও বাইরে এলো। এক গেলাস জল পেলে ভালো হতো। কে দেবে জল। এতক্ষণ এই ঘরে যারা এসেছে তাদের খালি বালতি থালা গামলা তরণীই ভর্তি করে দিয়েছে। এখন তরণীর দেয়া খালি গেলাস একটু জল ভর্তি করে দেবে কে? শমিতা খাবার সময় তরণীকে একবার আড়চোখে দেখলো আস্তে আস্তে সানাইয়ের শব্দ ঝিমিয়ে থেমে গেল। এত সরল, এত বোকামানুষ ও হয়? ও কি নিজের কথা কখনো ভাবে না? এই সেদিনও শমিতা অবাক হয়ে পাড়ার যাত্রায় দেখেছে— আর সব দাদারা ফুলবাবুটি সেজে এপাশে-ওপাশে ফুড়ুকফুড়ুক সিগ্রেটে টান দিচ্ছে. আর হাততালি দেবার ফাঁকে ওদের দিকে আড়চোখে চোরাগোপ্তা মারছে, তখন এই অদ্ভূত মানুষটা কখনো চায়ের ভাঁড় কেটলি কিংবা জরুরী কাজে ঘর-বার করছে—ঘোরে ছোটা মুখে লাগাম আঁটা একটা ঘোড়ার মতো। যেন কারো দিকে তাকাবার ওর সময় নেই।

এখনো সবাই ঘুমে। রাত আবছা হচ্ছে। তারপর শ্লেটরঙা আকাশটাকে কে যেন শুকনো কাপড় দিয়ে আস্তে আস্তে মুছে দিয়ে ওদিককার কোণে পাকা বটফলের মতো সূর্যটাকে কে যেন ঝুলিয়ে রেখে গেল। আকাশের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ যেন তরণীর ভালো লেগে যায়। মনে হোলো এ সময়ে সানাইঅলাদের তুলে দেওয়া দরকার। সানাইটা এ-সময়ে দারুণ জমবে। এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই গোটা পাড়ায় ভৈরবী ছড়িয়ে গেল। তরণীর এবার একটু বাড়ি

যাওয়া দরকার। সারা রাত মা দরজাটা খোলা রেখেছে কি না কে জানে। রোদ উঠতে না উঠতেই গোটা বাড়িটা যেন জালে তোলা মাছের মতো লাফিয়ে উঠলো। কোথায় হাওড়ার মাছ, কোথায় কসবার সস্তা মাংস। সারা সকালটা বারুদঠাসা ছুঁচো বাজির মতো উলোট-পালোট ঘুরে তরণী যখন এলো তখন প্রায় বেলা পড়ে এসেছে। ঘরের সবাইয়ের খাওয়া এখন শুরু হবে। লম্বা টেবিল। মলির কাছের বন্ধুরাও এসে পড়েছে। এবং এসেছে শমিতা। তরণী ছাতে উঠতেই ওরা প্রায় একসঙ্গে হৈ-হৈ করে উঠলো—এই তো তরণীদা এসে গেছে। একটা ঠাকুর কখনো এতগুলো লোককে দিতে পারে? তরণীদা, ভাই একটু ম্যানেজ করো। প্লিজ, এক নারীকণ্ঠ উত্তর দিলো। তরণীর সারা শরীরে ধুলো।—আচ্ছা ঠিক আছে আমি একটু হাত মুখ ধুয়ে আসছি।

শমিতা তাকালে লোকটার দিকে। খাওয়া দাওয়া শেষ হতেই ছাতের কলে হাত মুখ ধুয়ে হুড়মুড়িয়ে সবাই নেমে যাবার পথে শমিতা বললো—তরণীদা, আপনি খেয়েছেন?

—মানে?

শমিতা ঘুরে দাঁড়ালো। এখনো বলছেন খেয়ে নেবেন? জ্যাঠাইমা সিঁড়িটা পার হয়ে বোধ হয় ওপরে উঠছিলেন হঠাৎ তরণী নাম শুনে গালে হাত দিয়ে বললেন—ওমা, তরণী তুমি এখনো খাওনি। বসে পড়ো। শমিতা হঠাৎ বলে, জ্যাঠাইমা আমি যদি ওকে পাশের ঘরে জায়গা করে দি?

স্বর থেমে গেল। তরণী চিলকোঠার দরজা পেরিয়ে ছাতে এলো। বরকনেকে নিয়ে এবার ঘরের মেয়েরা বন্ধুরা হৈ হৈ করে ছাতে এলো। তলা থেকে টাটকা খাবার কাঁসার থালায় সাজিয়ে বাকী সব কাগজের ওপর পর পর সাজানো কলাপাতার সামনে চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়লো। শমিতা বসেছিল মলির ঠিক পাশে দামী ঢাকাই শাড়ি গোছের একটা টাঙাইলে। ওকে সবার চেয়ে আলাদা মনে হচ্ছিলো। ঠাকুরেরা এবার হাতা খুন্তি বেঁধে যে যার নিজের খাবার গুছিয়ে নিয়েছে। এখন আর দেবার মতো কেউ নেই। যাদের এ সময়ে থাকার কথা,

তারাও নয়, মাসীমা। বৌদিরা বললো আমরাই দিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু জায়গা ছেড়ে কেউ উঠলো না। তাছাড়া ওদের সামনে তরণী দাঁড়িয়ে থাকবে এটাই বা হয় কি করে? কোমরে করে একটা গামছা বেঁধে খালি বালতিটা তুলে নিলো। লৌকিকতার পরিবর্তে আশীর্বাদ কথাটা বেশ স্পষ্ট করে কার্ডে লেখা থাকলেও বিয়েতে কে কি দিল, কার সোনা ভারী এই নিয়েই টেবিল কলকলিয়ে উঠলো। তরণীর বোধ হয় কিছু দেওয়া উচিত ছিলো। হয়তো ততক্ষণে সেণ্ট শ্যাম্পু মাখা তরণীর বন্ধুরা মানে মাঞ্জা বাবু-বন্ধুরা মেয়েদের কার কি লাগবে জেনে তরণীকে পাত দেখিয়ে দিচ্ছিলো। শমিতার পাতের দিকেই প্রায় সবার নজর ছিলো বেশী। শমিতা বিরক্ত হচ্ছিলো তবুও।

রাত বাড়ছে।

খাওয়া দাওয়ার মাঝখানে হঠাৎ মলির মনে হলো—শমু, মানে শমিতাকে পৌঁছে দেবে কে? বাড়ি অবশ্যি বেশী দূর নয়, তবু এই রাতে শমিতার একা যাওয়া ঠিক হবে না। শমিতা বললো না না আমি একাই যেতে পারবো। না না, তা কি করে হয়? কথাটা মুখে মুখে সবার কানে পৌঁছলো। শমিতাকে বাড়ি পৌঁছে দেবার জন্যে প্রায় সবাই এগিয়ে এলো। যতীনবাবু বললেন—আমি তো ও রাস্তা দিয়েই যাবো আমিই না হয়…। শমিতা মলিকে আলতো করে বললো—না। অমর সেন বললেন—ঠিক আছে, আমার গাড়িটা তো ও রাস্তা দিয়েই যাবে, আমিই না হয় মিস ব্যানারজিকে লিফট দেবো। কথাটা বেশ গার্জিয়ানের মতো শোনালো। শমিতা বললো—না থাক। ততক্ষণে টেবিলের আশেপাশে দাঁড়ানো ছ-সাতজন সবারই রাস্তা মনে হলো শমিতার বাড়ির পাশ দিয়ে গেছে। জ্যাঠাইমা সমস্যার সঙ্গেই সমাধান করে দিয়ে বললেন—বরঞ্চ তরণীই শমুকে পৌঁছে দিয়ে আসুক, তা ছাড়া ভালো কথা, ওর মাকে ডেকে একটু বলেও এসো—কাল সকালে কনে যাবার আগে ওর মায়ের সঙ্গে যেন ও আসে। শমিতা, এবার আর কোনো প্রতিবাদ করলো না।

মোড় থেকে রিকশাটাকে গেটে থামাতে গিয়ে দেখে শমিতা আগেই এসে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তরণী বললো—উঠুন, আমি পেছন পেছন যাচ্ছি। না না, তা হয় না, তাহলে আমিও হাঁটি। এই তো কাছে। —সে কি করে হয় ?—তাবলে কি আপনি হেঁটে যাবেন আপনি উঠুন। অগত্যা তরণী প্রায় এককোণ ঘেঁষে সিঁটিয়ে রইলো। শমিতা ঠোঁটের কোনায় হাসিটা টেনে এনে বললো—আমি কি অস্পৃশ্য ম্লেচ্ছ নাকি ? যেন ছোঁয়া লাগলেই স্নান করতে হবে ? তবু তরণী সহজ হতে পারে না। চুপচাপ।

একটু থেমে হঠাৎ যেন শমিতা আচমকা বলে উঠলো—আচ্ছা তরণীদা, আপনি তো ওদের মতোই পড়াশোনা করেছেন, মুখ্যু তো নয়, তবু কেন আপনি বোঝেন না, ওরা আপনাকে ঠকাচ্ছে ? মানুষের ভানটাও ধরতে পারেন না, আপনি তো মানুষ, তাই না ? তরণী চুপ করে থেকে একবার শমিতার দিকে তাকায়। এরকম কথা ও এর আগে শোনেনি। —সপাটে একবার ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখুন না। তরণীর চোখটা যেন ছলছল করে উঠলো। তারপর শক খাওয়া মানুষের মতো আচমকা সিধে হয়ে তরণী সামনের দিকে তাকালো। বড় রাস্তার দু'পাশে সারি সারি হেলমেটপরা ঘাড় নীচু হ্যালোজেনল্যাম্পগুলো গার্ড অফ অনার দেবার ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে। রিকসাঅলাটাকে তরণীর তেজী ঘোড়া বলে মনে হলো। তরণীর বুকের মধ্যে এক ঝাঁক বিউগিল আর দামামার শব্দ। মোড়টা ঘুরতেই ব্লাইণ্ডলেনটা ফাঁকা। এতদূর আলো এসে পৌঁছোয় না। বাড়ি এসে গেছে। মাঝরাতে চৌহদ্দিতে কেউ নেই। হঠাৎ শমিতা আচমকা তরণীর হাতটা মুঠোয় চেপে বললো—কথা দিচ্ছেন তো ? তারপর হাতটা মুখের কাছে টেনে এনে স্পষ্ট করে একটা চুমু খেয়ে গাঢ়ভাবে বললো—পুরস্কারটা আমি আগেই দিয়ে গেলাম তরণীদা। জিততে আপনাকে হবেই।

কোথা থেকে যে কি ঘটে গেল, তরণী জানে না। তরণী এই প্রথম হাঁটবার সঙ্গে সঙ্গে নিজের পায়ের শব্দ শুনলো। তরণী এই প্রথম নিজে

নিজেই একটা সিদ্ধান্ত নিতে পারলো। যা একজন মানুষ পারে। নিজেকে নিজের মতোন করে ভাবতে ইচ্ছে হলো। খালি রিকসাটার *শব্দটা যেন দেবালয়ের ঘন্টির মতো মনে হলো।*

তরণী পথ হাঁটছে।······

হাঁটছে এবার নিজের পথে। ঘরে ফেরার পথে। এই প্রথম তরণী নিজের কথা ভাবতে ভাবতে পথ পেরুলো। আর, নিজেকে মনে হলো একজন মানুষ।

বড়োমানুষ।

শম্ভুর চোখে জল। বার বার বুকের ব্যথাটা চাড়া দিয়ে উঠছে

খাট

নাইকুণ্ডলী ডোবাতে ডোবাতে সকাল হয়ে এসেছিল। মাথায় মেঘ নিয়েই ঘাট থেকে উঠেএসেছিল ওরা। বাড়িতে ফিরতে না ফিরতেই শুরু হয়ে গেল ঝিরঝির। অকালের বৃষ্টি। শীত শীত। গা হাত পা যে সিঁটিয়ে আসছে। এখন এক পাত্তর হলে ভাল হত কিন্তু এখন আর ঘুরে চেতলা বাজারের দিকে যেতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। ঘাট-ফেরতা শ্মশানের পাশে পোলের তলায় গেলেই হত। ঢালাও চোলাইয়ের ব্যবস্থা। বারো আনার একটা গ্লাস ঢেলে নিলেই মিটে যেত। শম্ভু তাই-ই করে অন্য সময়। তখন শরীর আর বয় না। কিন্তু আজ যেন কিছুতেই কিছু ভালো লাগছিল না। মেয়েটাকে দেখার পর সেই থেকে কিছুই ভালো লাগছে না। সবার সেই বুক চাপড়ানো কান্নার সঙ্গে কখন যেন শম্ভুর চোখের পাতাটাও ভারী ভারী বলে মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল—বড়ো আপনার জনকে যেন ও আজ পুড়িয়ে এলো। একথা আরো একবার মনে হয়েছিল, সেই মায়ের সময়। এতো মা নয়, তবে ? তবে কেন একে দেখে বার বার শম্ভুর বুকটা যেন খালি হয়ে গেল মনে হচ্ছে। এমনটিতো আর কখনো হয়নি।

সেই তখন থেকেই বুকের ব্যথাটা আবার নতুন করে চাড়া দিয়ে উঠছে। বুকটা একবার হাতের চেটো দিয়ে চেপে শম্ভু ভাবলো—নাঃ, এবার একদিন ঘোষাল ডাক্তারকে দিয়ে ভালো ভাবে পরীক্ষা করিয়ে নিয়ে ওষুধ টষুধ টাইম মতো খেতে হবে। আর ডাক্তার, শালা ছু বেলা ছুটো দাঁতে কাটতে পারলে মনে হয় অনেক গো-জন্মের পুণ্যি। ছুবেলা পেটের জ্বালা মেটাতে যাকে মড়ার খোঁজ করতে হয়। সব কিছু জোগাড়যন্তর করে শেষপর্যন্ত ছু' পয়সা হাতে এসে যায়। এর ওপর ছুটো বিনি পয়সায় ভালো খাওয়া। এ বাজারে

তাই বা কম কিসে। এ ভাবেই ব্যাপারটা এখন পেশায় দাঁড়িয়ে গেছে। নাম ছড়িয়েছে শম্ভুর। চেতলা কালীঘাট টালিগঞ্জ নিউ-আলিপুর অবধি পাড়ার লোকজন খবর দিয়ে নিয়ে যায়। দিলেই শম্ভু তৈরী। আগে তো একদিনে দুটো তিনটে পর্যন্ত সেরে এসেছে। আজকাল পারে না। না বেরুলে নয় বলেই বেরুনো; তা না হলে কদ্দিন ও ভেবেছে, এবার ছুটি নেবে। এ বয়সে আর ভাল্লাগে না। মনে হয়—হরি হে, এবার পার কর।

শম্ভুর চোখে জল। বারবার যেন বুকের ব্যথাটা চাড়া দিয়ে উঠছে। মইনুদ্দি মিস্ত্রি লেনের মাটির একটা খুপরীতে কাঁথা মুড়ি দিয়ে শম্ভু ওপরের টিনে বৃষ্টির ছাঁটের আওয়াজের সঙ্গে অনেক দূরে চলে যাচ্ছিল। আওয়াজটা শুনতে চোখটাও কখন ঝাপসা হয়ে আসে। ভাবছিল আজকের মেয়েটার কথা। ঠিক গ্রামের সেই বিন্দুর মতো দেখতে। এ্যদ্দিন বাদে কেন যে আবার বিন্দুকে মনে পড়লো। কেন যে এরা হঠাৎ আসে, চোখের জল হয়ে ধুয়ে যায়। সময় বোঝে না, ক্ষণ বোঝে না, স্মৃতি হয়ে হঠাৎ আচমকা লাফিয়ে পড়ে বুকে। থেকে থেকে মুখটা মনে পড়ছে। হে ভগবান তুমি কি এক লহমার জন্যে এই মুখটা সরিয়ে নিতে পারো না? না, কেউ পারে না, মইনুদ্দি লেনের মাটির খুপরী থেকে মুখটাকে কেউ সরিয়ে নিতে পারে না। চিতায় তোলার আগে মেয়েটা যেন কলজের ফাঁকে ঢুকে গেছে। কি হয়েছিলো বিন্দুর মতো মেয়েটার? যেন সাজানো কাঠের ওপর শুয়ে ও ঘুমিয়ে রয়েছে, যেন ভোর হলেই ঘুম ভাঙবে। প্রতিমাকে পোড়ানো যায়? পোড়াতে আছে? শাহ্, ডাক্তার, ধানদুব্বো দিয়ে লেখাপড়া শিখেছো; মেয়েটাকে বাঁচাতে পারলে না বাঞ্চোৎ।

আর এখন ভেবেই বা কি হবে।

যারা যায় তারা এমনি করেই সরে যায়।

কত লাশ পিটিয়ে খুঁচিয়ে ঠ্যাং দুমড়ে মুচড়ে দিয়েছে ডোম। ভালো লেগেছে শম্ভুর। তাড়াতাড়ি ঢুকলে সরে পড়া যায়। কাঠ যত দাউ দাউ করে জ্বলেছে শম্ভুর চোখে তত উল্লাস। কিন্তু এ মেয়েটাকে এরা কেন কাঠেতে দিল, ইলেকট্রিক চুল্লিতে দিলে তো চোখের সামনে দেখতে

হোতো না। কাঁচা কাঠ, আহা, তাতেই যেন মোমের মতো গলে গেল, যেন কচি শিশুকে আগুনের পাত্রে দেখা যায় না। উফ্ ভগবান, একেও তুমি শম্ভুর ভাগ্যে দিলে? শেষ পর্যন্ত পিজিতে শম্ভুর না গেলেও তো চলতো। শম্ভুর দুচোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ল নীরবে। শম্ভুর হাসি পেল, শালা তুমি কাঁদছো শম্ভু। ন্যাকামো কাপড়ের খুট দিয়ে চোখের জলটা ঝপ্ ক'রে মুছে নিল শম্ভু। আজকে ভিজে সর্দি মতোন হয়েছে।

আজকাল ঠাণ্ডা শরীরে একটুও সহ্য হয় না। ধাতটাই যেন কেমনতরো হয়ে গেছে। ঘুমে শম্ভুর চোখ বুজে আসছে।

চালের ওপর বৃষ্টি যেন অষ্টমী পূজোর বাজনা শুরু করে দিয়েছে। কত নামবি নাম। বৃষ্টির পরোয়া করে না শম্ভু। কতোদিন এই বৃষ্টিতে পিজি থেকে বডি খাটে করে নিয়ে এসেছে। তার আগে খাট কিনেছে, ফুল এনেছে, তোড়া সাজিয়েছে, অগরু ছড়িয়ে দিয়ে লাশ এর ওপর গোছা ধূপ জ্বেলে দিয়েছে···। নিজের মনেই হেসে ফেললো শম্ভু সেবারে এক স্বামীর কি কান্না, ওগো—তুমি চলে গেলে, কার পাশে রাতে আমি মনের কথা বলবো গো ও ও। সেই জোয়ান মদ্দটাকে সামলে যেন এক লাফে চলে এসেছিলো কেওড়াতলায়, তারপর কাজকম্ম শেষ ক'রে সুদে আসলে বুঝে নিয়েছিল শম্ভু। পার্টিকে ছাড়তে হবে, তা নাহলে শম্ভুরই বা চলবে কি ক'রে। সে এক একটা সময় গেছে। সিজন পড়লে পাড়ার বেকার ছেলের চেয়ে শম্ভুকে ডাকলে আয় দেয় বেশী। সেবার কি একটা রোগ এল জ্বর হচ্ছে আর মরছে। আর একটা সিজন এলো কলেরার মতোন। এত লোক মরতে শম্ভু এর আগে দেখেনি। কি কাজ কি কাজ। চৌপরদিন খাওয়ার সময় পাইনি। এই চান করে এসে বসেছি, জিরেন দিতে, আবার ডাক।

আজকাল আর শম্ভু পারে না। শরীরটাও নড়বড়ে হ'য়ে গেছে। আর দেয় না। মাথা হালকা চুলে যেন কে চুনের পোঁচ মেরে দিয়েছে। আর শরীর দিয়ে কি হবে। পিছুটান নেই কার জন্যে শম্ভু বাঁচবে। একটা মা ছিল, তা সে বুড়িও কদ্দিন হ'ল টেঁসেছে। মায়েরা মার

মতোনই হয়, বুড়ি মরার আগের দিন পর্যন্ত লম্ফ জ্বালিয়ে রাত অবধি দোরগোঁড়ায় বসেছিল। না ফেরা পর্যন্ত বুড়ি বসেই থাকতো। মাঝরাতে গলার আওয়াজ পেয়ে কোটর থেকে চোখ বের করে খনখনে গলায় বলতো—সমু এলি বাবা ?

কতদিন ঝাঁঝিয়ে উঠেছে সমু। তা বারবার বার করা সত্ত্বেও বুড়ি বসে থাকবে। সেই এক কথা ইনিয়ে বিনিয়ে বলবে—তুই না এলে বাবা এ পোড়ার চোখে ঘুম আসে ধন ? তারপর সানকীতে ভাত ডাল তরকারী সাজিয়ে দিয়ে বসে থাকতো বুড়ি। বাবার জন্যেও না কি এমনি করে বসে থাকতো। শালা, বুড়িও টেঁসে গেল। তবে হক্ কথা, কেউ বলতে পারবে না, মাকে কি সাজিয়ে নিয়ে গিয়েছিল শম্ভু।

তারপর থেকে শম্ভু ঝাড়া হাত পা।

ব্যথাটা বড্ডো চারা দিয়ে উঠছে।

কাঁথাটা টান টান করে গায়ে জড়িয়ে ঘুপচি পাকিয়ে দ হয়ে শুয়ে থাকলো শম্ভু। টুং টাং করে এখনও মাথার ওপরে বৃষ্টির শব্দ। আর এই সময়েই আওয়াজ জোরে দরজায় ফাঁক গলে এলো—

শম্ভুদা আছো না কি ? শম্ভুদা…। শম্ভুদা, শম্ভুবাবু, এই শালা শম্ভু, শেষ পর্যন্ত চীৎকার হয়ে দাঁড়ালো। নাঃ শব্দের ভাষা শম্ভু চেনে, আজ যাবে না। কারো বাপের চাকর নয় শম্ভু যেতে হবে। ঘাপটি মেরে শুয়ে রইলো শম্ভু, বুকের যন্ত্রণাটা মাঝে মাঝেই চাগাড় দিয়ে উঠছে। নিঃশ্বাস বন্ধ করে শুয়ে রইলো শম্ভু। দরজাটা ভেঙে ফেলবে নাকি ? একে পলকা টিন। একই ধারের মাটি আলগা হয়ে গেছে।

নাঃ, না উঠে আর উপায় নেই।

উঠে পড়লো শম্ভু।

উঠতে গিয়ে একটা খিচ ধরলো বুকে। খানিকক্ষণ উবু হ'য়ে ব'সে দম নিয়ে আলতো গলায় জিজ্ঞেস করলো কে রে ? গলার আওয়াজ পেয়ে দরজার ওপর শব্দটা আরো জোর হল।

আরে দাঁড়াও খুলছি। এগিয়ে এসে দরজা খুলতেই প্রথমেই মুখ বাড়ালো মানুকে। পাশে একটা বুড়ো, তার পাশে একজন ধুর পাটি। তবে বেশ বড়লোক বড়লোক চেহারা। কাছে পিঠের কেউ হবে।

লোক দেখে শম্ভুর ঠাহর করে নিতে ভুল হয় না। এদের যা অবস্থা, তাতে দাওয়ায় আসুন বলার সময় নেই ভিজে কাকের মতো শুড়্‌ডাটা দাঁড়িয়ে বৃষ্টির ছাট ঘরে ঢুকছে।

শম্ভু কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই মানকে বললো, এদের উদ্ধার করে দিতে হবে গুরু।

তুই যা, আমার শরীরটা বেগড় বাই করছে। ভালো নেই!

—কি যে বলো—তোমার আবার শরীল খারাপ, ও আমি ঠিক করে দেবো। পাটি ঘ্যাম···কথাটা একটু আস্তে বললো শম্ভুর কান ছুঁইয়ে।

—চলো বাবা বড্ডো বিপদে পড়েছি। পাড়ার ছেলেগুলোকে পাচ্ছি না, এই দুর্যোগে, কেউ সাড়া দিচ্ছে না। কাকেই বা বলবো, চাঁদার সময় তাদের সময় অসময় নেই। এখন আমার এই বিপদ, মায়া মমতা বলে কি কিছু নেই। শোকতাপে মাথা কারো ঠিক নেই বাবা। বুড়ির একটা সদগতি করে দাও, আমি তোমাকে পুষিয়ে দোবো।

চলো গুরু।

আপনারা ক'জন আছেন কাঁধে?

জনা তিনেক হবে।

ঠিক আছে, চলুন। ভেতরে ঝোলানো তার থেকে গামছাটা হ্যাঁচকা মেরে টান দিয়ে নিয়ে এসে দরজায় তালা মেরে বৃষ্টি মাথায় নিয়ে নেমে পড়লো শম্ভু, পেছনে মানকে, তার পেছনে দুই বুড়ো।

জোরে হেঁটে একদমে পৌঁছে গেল শম্ভু। না মানকে ঠিকই বলেছে, পার্টি ঘ্যাম।

সেই বুড়ো ভদ্রলোক হাঁপাচ্ছে সিঁড়িতে বসে।—বডি কোথায়? শম্ভু মাথা মুছতে মুছতে বললো।—ওপরের ঘরে।—ঠিক আছে, মাল ছাড়ুন,—মানে? আরে মাল্লু মাল্লু, দুটো আঙ্গুল টস করা ভঙ্গীতে বললো খাট ফাট ফুল আনতে হবে না।

হ্যাঁ বাবা খুব করে সাজিয়ে নিয়ে যেও। এক গোছা দশটাকার নোট শম্ভুর হাতে গুজে দিলেন ভদ্রলোক। খাট এনো।—আয় মানকে শম্ভু, শরীরটা সিধে করার চেষ্টা করে রাস্তায় নামলো।

অন্য সময় হ'লে জগুবাবুর বাজার অবধি এ পথটুকু হেঁটেই মেরে দেয় শম্ভু। সিধে গোপালনগর পেরিয়ে জেলের পাশ দিয়ে চৌধুনি পোল ধরে শাঁখারিপাড়া পেরুতে পারলে আর কতটুকু? আজ আর ইচ্ছে করলো না। শম্ভু একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেল।

মান্‌কে হুট করে উঠে বললে—গুরু, ট্যাক্‌সী করলে? ব্যাক করেই আমি সিধে চলে আসবো।

সত্যি তো! শম্ভু ভাবলো—ওকে আটকানো যাবে না।

ও চলে গেল।

যন্ত্রণাটা বাড়ছে। বাস যে কখন আসবে। পকেট থেকে একটা বিড়ি বের করে, দু আঙুলে চেপে খানিক এপাশ ওপাশ ঘুরিয়ে, পেছন সামনে দুবার ফুঁ দিয়ে ধরালো শম্ভু। মানকে ওর ঠেক্‌-এ চলে গেল। থাকলে ভালো হত। জগুবাবুর বাজারটাকে আজ এতদূর বলে মনে হচ্ছে।

বাস আসতেই ঠিকানাটা মনে মনে একবার ঝালিয়ে ও উঠে পড়লো। একবার ভাবলো নেমেই যাই।—পারবো না। কারো বাপের চাকরতো নই যে যেতে হবেই। আমি যাবো না। আমার যেতে ইচ্ছে করছে না। টাকাটা ফেরত দিলেই ল্যাঠা চুকে যায়। টাকার কথা মনে হতেই বুক পকেটে হাত দিয়ে ঠাহর করে নিল ঠিক আছে কিনা। শম্ভু নিজের মনেই হাসলো। এখন ভগবানের দিব্যি দিলেও কেউ বিশ্বাস করবে না। ভাববে কিছু মাল বেশী হাতাতে চাইছে। দাঁও মারছে শম্ভু। ভাবতে ভাবতে কখন যেন ও এসে পড়ল।

বৃষ্টি ধরতেই পরিস্কার বিকেলটা আকাশ থেকে বেরিয়ে পড়েছে।

পাপ পাপ! এসব কথা ভাবাও পাপ। যতক্ষণ আছি মানুষের সদগতি করে যাই। পরপারের খাতায় কিছু পুণ্যি জমা হোক। চিত্রগুপ্ত কাউকে ছাড়ে না, সে ঠিক লিখে যাচ্ছে জমা খরচের হিসেব। কারো পার নেই।

বুকের ব্যথটা ক্রমশঃই চারিয়ে উঠছে। দম যেন বন্ধ হয়ে আসছে শম্ভুর। ভগবান ভগবান করে দোকানে এসে ফুটপাতের পাশে

ঝোলানো একটা পছন্দসই খাটের দিকে আঙুল দেখালো! ঠিকই আছে। অভিজ্ঞ চোখ, দোকানদারও চেনে। এখন আর দরদাম করতে হয় না একটা রেট ঠিক হয়ে গেছে। খাটটা নামিয়ে দড়ি দিয়ে টানটান করতে হয়। একটু সময় লাগে। তা নাহলে লাশ গলে যাবে। শম্ভু আর পারে না উবু হয়ে পাশে বসে পড়লো—কিগো শরীর খারাপ নাকি? খাটটা নামাতে নামতে দোকানী জিজ্ঞেস করলো। নাঃ, বয়স তো হল। যাই ওদিককার মালটালগুলো নিয়ে আসি। তোড়ার দোকানে গিয়ে ভালো দেখে একজোড়া তোড়া বাছলো শম্ভু, দরদাম করতে পারলে কিছু বেশী টানা যেত এতেই তো হাফ চলে আসে। একটা গোড়ের তাজা মালা জল ছিটিয়ে গুছিয়ে রাখছিল। শম্ভু ওটাও নিয়ে নিল। বুড়ির ভাগ্যি আছে বলতে হবে। এক শিশি আলতা। এক প্যাকেট গোছা ধূপ। অগুরু, নতুন কাপড় সব আঁকড়ে কুঁজো মতোন হয়ে খাটের কাছে এসে দাঁড়ালো শম্ভু।

এক বগলে কাপড় পকেট বোঝাই জিনিস। এ বগলে তোড়া আরেক হাতে খাটটা ঝুলিয়ে ভাবলো—এবার। এবারতো পা ছাড়া গতি নেই। এককাপ চা খেয়ে নিলে ভালো হত। ব্যথা অনেক সময় গরম চায়ে চলে যায়। থাক্‌গে বেলা পড়ে আসছে। শম্ভু রাস্তা পেরুলো।

দূরে পোল। শম্ভু আবছা রাস্তা দেখলো। চোখের দুটো মণি কি ঘোলা হয়ে আসছে? শম্ভু দাঁড়িয়ে একবার জোরে নিঃশ্বাস নিল। হাত পাল্টালো। কবরখানা পেরিয়ে পোলে উঠতেই যেন সমস্ত শিরা টান টান দড়ি হয়ে এলো। শম্ভু যেন নিজের কফিন নিজেই বয়ে নিয়ে যাচ্ছে।—হে ভগবান এটুকু পথ পার করে দাও। হে মা কালী, শম্ভুর যেন ইজ্জৎ থাকে। পোলের ওপরে উঠতেই হাঁফ ধরে গেল। হাঁফ যেন আর নামতে চায় না। দম চোখে এসে আটকেছে। মা মাগো কেন আবার শ্মশানের মেয়েটাকে আরেকবার মনে পড়লো। শম্ভুর মনে হল ও যেন খুব কাছে এসেছে।—হ্যাঁ গো তুমি হাসছো কেন? এসময় কি হাসতে আছে? দেখছো না আমার বুক যন্ত্রণায়

ছিঁড়ে যাচ্ছে। আমি দম নিতে পারছি না। তোমার বুঝি এমন কষ্ট হয়েছিল? মেয়েটা চোখের কোল থেকে সরে গেল। মাও সরে গেল। শুধু একটা অন্ধকার পোলের ওপার থেকে শম্ভুর দিকে এগিয়ে আসছে। আর একটু পথ। আর একটু···। পোলের রেলিংটা ধরে একবার টাল সামলালো শম্ভু তারপর হুমড়ি খেয়ে রেলিংয়ের গায়ে গড়িয়ে পড়লো। ছড়িয়ে পড়লো সাদা জুঁইয়ের মতো খই। রজনী-গন্ধার মালাটা ঘাড়ে এসে গুটিয়ে রইল। মাথার পাশে তোড়া। যেন এক্ষুণি কেউ সাজিয়ে তুলবে।

জেলখানার মাঠে খেলা ভেঙেছে। একজন দু'জন করে সবাই দৌড়ে এলো।—শালা টেঁসে গেল নাকি রে? পোলের তলায় জেলকলোনী থেকে বৌঝিয়ারীরা ছুটে এসে বললো—আহারে! কোথাকার লোক গো?

হৈ-হৈ করে ছেলেরাই খাট সাজিয়ে দিল ধবধবে চাদরে রজনীগন্ধার মালা মাথার দুপাশে দুটো ফুলের তোড়া অগুরুর গন্ধে শম্ভুকে যেন আর চেনা যায় না। একগোছা ধূপ জ্বালতেই গন্ধ ছড়িয়ে পড়লো রাস্তায়—তারপর দূরে আরো দূরে।

দ্যাখো তো আমার মুখে কোন দাগ আছে কি না ?

মুখটা এবং সেই মুখটা

শুনছো, তোমার মাফলারটা একটু ঠিক করে জড়িয়ে নাও।

ঠিক করে নিলুম।

আচ্ছা, গলার বোতামটা লাগাচ্ছো না কেন ?

লাগিয়ে নিলুম।

তোমার কোটের বুকটা ভালো করে আটকে দাও তো।

ধ্যাত্, অ্যাতো ঠাণ্ডা পড়েনি। অদিতি বললো—দাও না। বললুম—না, এমন শীত কিছু গায়ে লাগছে না যে কম্বল মুড়ি দিয়ে থাকতে হবে। জিনিসপত্তর গুছোতে গুছোতে অদিতি বললো—ট্রেন থেকে নামলেই বুঝবে। কথা না বাড়িয়ে বুকটা আটকে দিয়ে বললুম—এবার আয়নাটা দাও তো, খুপসুরত চেহারাটা কেন হ'ল একবার দেখে নি।……আমি এখন আবার ঐ ব্যাগট্যাগ হাঁটকাতে পারবো না। আর এই অন্ধকারে তোমাকে দেখছেটাই বা কে !

ঝুক্…ঝুক্…ঝুক্…ঝুক্ ঘণ্টা নাড়িয়ে পাহাড়ি স্টেশনে এসে ট্রেন থেমে গেল। ঝিরঝিরে বৃষ্টি, একটু হিম হিম হাওয়া বইছে। শীতটা যেন চেপেই বসবে বলে মনে হয়। এই অসময়ে সবাই এখানে আসতে বারণ করেছিলো, কিন্তু যে স্মৃতির যন্ত্রণা কাঁটার মতো হৃৎপিণ্ডে বিঁধে আছে। তাকে তোলার জন্যে সময়েরও প্রয়োজন, জায়গা বদলেরও। আচ্ছা, আমরা কি সবাই এমন একটি যন্ত্রণার পিনকুশন বুকের মধ্যে আগলে রাখি ? কি জানি।

আমার এখন একটুও সময় নেই। আমার যা কাজ তাতে সময় পাওয়া যায় না। যাঁরা নৈমিত্তিক ছুটি পাওয়ার দলে, তাঁদের মধ্যে আমি পড়ি না। আমাকে নিজেকেই নিজেকে টেনে হিঁচড়ে বার করে নিয়ে আসতে হয়। আর ওই মুখটা ? ও আমার একটু আগে এসেছে, ওর একটা চোখ শুকনো কোটর থেকে ঠেলে বেরিয়ে এসে মণিটা যেন

ফ্যাকাসে কাঁচের গুলির মতো এদিক ওদিক হয়ে অদিতির দিকে এক-পলক থেমে ওর চোখের আঙ্গুল দিয়ে অদিতির সারা শরীর একবার বুলিয়ে নিল। আমি একবার নিজের মুখে হাত রাখলুম, আমার সারা গা-টা কেমন যেন গুলিয়ে উঠলো। আচমকা আমার মুখ থেকে সিগারেটটা পড়ে গেল। নতুন করে আর ধরাতে ইচ্ছে করছিলো না। নিজেকে এত ভারী বলে মনে হচ্ছে।

কি হোলো? কি হয়েছে তোমার?

কি হবে? কৈ কিছু না তো?

তবে?

কি তবে? চলো......অদিতিকে রেখেই যেন একটু এগিয়ে গেলুম।

এমনিতেই নতুন জায়গায় আমার ঘুম আসে না; কিন্তু আসা উচিত ছিলো, সারাটাদিন এত ক্লান্ত ছিলুম। অদিতি কেমন ঘুমুচ্ছে, কেমন নিশ্চিন্ত প্রশান্তি। কেউ জেগে নেই, এখন কেউই জেগে থাকে না। জানলা দিয়ে যতদূর চোখ যায়—দেখছি সমস্ত বিশালতার খাঁজে খাঁজে আলগোছে একেকটা করে বাড়ি বসিয়ে রাখা হয়েছে। তাদের প্রত্যেকের মাথায় টিপের মতোন একটা করে আলো। সারা শহরটাকে কে যেন আলতো করে একটা ফুলের মালা পরিয়ে দিয়েছে। ভাবলুম—নাই বা ঘুম এলো, রাতের চাদর ছিঁড়ে কেমন করে ছাড়ানো লেবুর মতো সূর্য ওঠে, আজ না হয় তাই দেখি। এও তো কম পাওয়া নয়। দূরে খানিকটা চোখ রাখতেই আবার সেই মুখ যেন পাহাড়ের খোদল থেকে উঠে এলো। আকাশে—ও, বাতাসে—ও, স্থলে জলে অন্তরীক্ষে ওই একটা মুখ। আমার ব্যাগ থেকে টান মেরে আবার প্রিয় আয়নাটায়ও আমাম স্ট্র্যাপ ছিঁড়ে গেল। আমার আলোয়ান গুটিয়ে গলায় ফাঁস হয়ে এলো। আমার কপালে ঘাম আমার বুকে ঘাম, আমার পাঞ্জাবীর তলার গেঞ্জী ভিজে শপশপে হয়ে আসছে।

আমার ঘরটা রাস্তা থেকে দেখা যায়। অদিতি জানালায় দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছিলো। এ মুহূর্তে ওকে আমার এমন অবলম্বন বলে মনে হোলো। দরজা ও খুলেই রেখে দিয়েছিলো। ওকে দু'হাত দিয়ে বুকের কাছে টেনে নিয়ে এসে বললুম—জানো, সেই লোকটা। কোন্

লোকটা ?······সেই।—অদিতি তাড়াতাড়ি ফ্যানটা অন করে স্পিডটা একটু বাড়িয়ে দিলো। বললুম—আয়নাটা ? আমার আয়নাটা একটু নিয়ে এসো তো। কেন ? আয়না কেন ? আমি মুখটা তুলে বললুম—ছ্যাখো তো আমার মুখে কোনো দাগ আছে কিনা ? দেখি দেখি। কই না তো, দাগফাগ কিছু নেই। আমি অনুনয় করে বললুম—না, তুমি একটু করে ভালো করে ছ্যাখো, প্লিজ। অদিতি গজগজ করে উঠলো—কি যে রাতদিন জেগে ছাইভস্ম ভাবো! না ঘুমুলে মানুষের শরীল টরীল ঠিক থাকে। আমার কোলের উপর আয়নাটা ফেলে ও চলে গেল।

বিকেলে আমরা ছ'জনেই বেরুলুম। ছ'জনেই আমরা ফিটফাট। অদিতি বাজারে গিয়ে কতোরকম পাথরটাথর কিনলো। একেকটার গা দিয়ে কতোরকম রঙ ঝলসে যাচ্ছে। ছিটনো রঙ অ্যাতো সুন্দর লাগে ? দোকান থেকে বেরিয়ে বললাম—আমি কিন্তু একটা ছবি কিনবো, কাঞ্চনজঙ্ঘার। এখানে এসে দেখেছি সব্বাই একটা করে ছবি নিয়ে যায়। অদিতি বাচ্চা মেয়ের মতো লাফিয়ে উঠলো—যেখানে খুশি বেড়াবো। তাতে কার কি। থাক্ বউ বউ করে আর আদিখ্যেতা করতে হবে না! (অদিতি কতো নিষ্পাপ, কত পবিত্র। আমার ভীষণ অদিতি হতে ইচ্ছে করছিল। সমস্ত বিষাক্ত স্মৃতি পুরনো কাপড়ের মত ছুঁড়ে আমি অদিতি হতে চাইলুম)।

ওম্মা, তাই নাকি! ছবি পাওয়া যায় ? সারি সারি ? ফটোর দোকানে কতোরকমের রঙিন ছবি। এক শৃঙ্গের কতো চেহারা, এক শরীরের কতো আদল। অদিতি বললো—চা কিনবে না ? জানো, প্রমীলাদি এখান থেকে কিরকম ফাস্টক্লাস চা নিয়ে গেছে কি তার ফ্লেবার! আমি বাপু একটু বেশী করেই কিনবো, আবার কবে না কবে আসা হয়। উফ মেয়েরা কেনা-কাটা করতে অ্যাতো ভালবাসে।

আমার বগলে বাঁধানো ছবি, ওর হাতে হরেকরকম প্যাকেট। আমরা হাঁটতে হাঁটতে কতদূর চলে এলুম। নির্জনে একটু ফাঁকা পেয়ে একটা হাত আলগোছে ওর কোমরে রাখলুম; ও চকিতে সরে গিয়ে বললো—অ্যাই, কি হচ্ছে কি! বাঃ কি হচ্ছে মানে ?

আমার বোনাফায়েড বউকে নিয়ে আমি যেভাবে যা ইচ্ছে করতে পারি।

আমি ওর পিঠে হাত রাখলুম। কাছাকাছি, অথচ আমরা কত দূরে। সামনের একটা গাছের পাশে হেলান দিয়ে আমরা দুজন। ছবিটা গাছের গায়ে দাঁড় করিয়ে পকেটে হাত দিলুম। একটা সিগারেট ধরাতে যেতেই কে যেন হিম-শীতল গলায় জিজ্ঞেস করলো—ম্যাচিস? জ্বলন্ত বারুদটা হাত থেকে খসে পড়ে যেতেই আমি প্রচণ্ড চীৎকার করে বললুম—কে কে, কে আপনি? কে আমি—ই…কে—ই—কে—ই …আপনি কে—কে…ই ই…ঈ…ঈ…। পাথরের চাঙড়ে ধাক্কা খেয়ে আমার কথা প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে এলো। অদিতি ভয়ে কিংবা চমকে গিয়ে বললো—কি হয়েছে? শরীরটা খারাপ লাগছে? ও আমার বুকের কাছে এসে সরে এলো। বললুম—তুমি শোননি কিছু?' না, নাতো। কিচ্ছু না? না। অদিতি বললো—আমিতো তোমার পাশেই ছিলাম। তুমি নিশ্চয়ই শুনেছো।

নাগো না, বিশ্বাস করো। আমি মুঠোয় চুল চেপে বললুম—আমি বিশ্বাস করি না কাউকে নয়। অদিতির দুটো চোখে ভোরের শিশিরের মতো জল। ও আরো কাছে এসে বললো—তোমার হাত তো আমার হাতে, মনটা কি করে ভুল করে বলতো। তবু আমি মাথা নাড়লুম। অদিতি ভিজে চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো। আমার এক্ষুনি, এক্ষুনি হোটেলে ফেরা উচিত। আমার সেই আয়নাটা।

সহ্য হয় না। তাই আগেভাগেই চলে এলুম। জানি, দু' দিন বাদে পূজোর ছুটি পড়তে না পড়তেই এখানে লোক ঝেঁটিয়ে চলে আসবে; শুনেছি তখন নাকি হোটেলগুলোর বারান্দায় পর্যন্ত বেড পড়ে যায়। সেই ভিড় ট্রানজিস্টার, সেই পোশাকআসাকের চেনা মুখ, হই হল্লা, শস্তার মাল খোঁজা, সব কিছু মিলিয়েই আবার সেই শহর কলকাতা যেন সমস্ত শহরটাই ভোজবাজীর মতো রাতারাতি হিমালয়ের কোলে চলে এসেছে।

পাহাড়ি জায়গা আমার বরাবরই ভালো লাগে! এই দূর পাহাড়ের গায়ে আমার যে কি সুখ লুকিয়ে থাকে।

সত্যি, সুখ কথাটার আসল মানেটা যদি জানতে পারতুম। আমার মাথায় এক যন্ত্রণা সর্বক্ষণ ঘুণপোকার মতো কুরে কুরে খাচ্ছে। তবু আমি সুখী। ভোর থেকে রাত পর্যন্ত আমি এক ধোপদুরস্ত মানুষ। আমার সুন্দরী স্ত্রী আছে। খরচ করার মতো কিছু পয়সা আছে। আমি আমার পছন্দমতো একটা ফ্ল্যাট নিয়েছি ; সল্ট লেকে জমি কিনবো কিনবো ভাবছি, আমার একটা অলিভ রঙের ছোট্ট ফিয়াট আছে, ফ্রিজে আমার এক সপ্তাহের মাছ মাংস সবজী ঠাসা থাকে। তবু কেন ? কেন এই যন্ত্রণা। কি খুঁজছি আমি। কাকে ? কি সুখ। তাহলে কোথাও না কোথাও হয়তো কিছু আছে।

আচ্ছা, তোমার গাড়িটা থাকলে খুব ভালো হোতো, না ? অদিতি খুশি খুশি। দেখছো, কি ঝকঝকে রাস্তা। বিউটি ফুল ! সত্যিই সুন্দর। জায়গাটা আমারও খুব ভালো লাগছিল। আমার চোখের সামনে হালকা অন্ধকারে কাছের পাহাড়গুলো সতর্ক বিশাল প্রহরীর মতো অনড় অটল মনে হচ্ছিল। এই বিরাট ব্যস্ততার সামনে যেন নিষ্পাপ শিশুর মতো নতজানু হয়ে অকপট সারল্যে সবকিছু বলে যাওয়া যায়।

স্টেশনটাও ততক্ষণে হালকা হয়ে এসেছে। ঝির ঝির ঝরছে তো ঝরছেই। একটু শীত শীত। জিজ্ঞেস করে জানলুম আমাদের হোটেলটাও খুব বেশী দূরে নয়, হেঁটেই যেতে হবে। একটা সিগারেট ধরাতে ইচ্ছে করছিলো। প্যাকেট থেকে একটা বের করে ঠোঁটে লাগিয়ে সবে জ্বালাতে যাবো, ঠিক এমনি সময় আমার মতোন একটা লোক তাঁর হাতে অ্যাটাচি, কলকাতায় যেমনি আমার হাতে থাকে। ঠিক আমার মতোন একটা টুপি। গায়ে আমার মতোনই একটা গভীর কালো কোট। হাতটা কিছু বাড়িয়ে বললো—ম্যাচিস আছে ?

হ্যাঁ আছে।

ফস করে দেশলাই জ্বালতেই ওর মুখটা চকিত জ্বলে উঠেই আবার নিভে গেল। মাত্র কয়েক মুহূর্তে। উফ কি ভয়ঙ্কর। কারো মুখ এত ভয়াবহ হতে পারে ? ওর ভুরু খানিকটা কেটে কপাল পর্যন্ত এগিয়ে মুখ রাখলুম। নেই, কেউ নেই এখন শুধুই আমি। আমারই

মুখ। হে ভগবান, সারাটা রাত কি তাহলে আমি আয়না নিয়েই দাঁড়িয়ে থাকবো।

অন্ধকারের গা চুঁইয়ে ভোর নামলো। ভাবলুম—আমার এখন প্রথম কাজই হবে দাড়ি কামানো, তারপর পাট ভাঙা সার্ট প্যাণ্টের উপর একটা সোয়েটার চাপিয়ে নোবো। নাঃ বরঞ্চ পাজামা পাঞ্জাবীই বেটার, তার উপর আলোয়ান চাপিয়ে নেয়া যাবেখন। শেভ করে গালটা খুব মসৃণ মনে হোলো, দু'বার গালে হাত বুলিয়ে স্নান সেরে নিলুম। বেশ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগছিলো কিন্তু উপায় নেই, হঠাৎ গুনগুনিয়ে গানের কলি বেরিয়ে এলো অদিতির ঘুম ভাঙেনি আধেক ঘুম থেকে ও কি জিজ্ঞেস করলো—কোথায় বেরুচ্ছো? এই এখানে। দ্যাখো, আকাশটা ঝকঝকে। বেরুবে? না গো বড্ড ঘুম পাচ্ছে, আমি কাল যাবো. কেমন? ও পাশ ফিরে শুলো।

তখনো সূর্য ওঠেনি, উঠবে। সকালের জলপাই আকাশ। আশপাশ পাহাড় কেটে বসানো বাড়িগুলোর মাথা দিয়ে গুলগুল ধোঁয়া বেরিয়ে মেঘের মতোন আকাশে মিশে যাচ্ছে। রঙিন পোশাকের মানুষজনেরা টুকটাক এদিকওদিক থেকে বেরিয়ে আরেক আড়ালে মিশে যাচ্ছে। হঠাৎ দু'একজন হনুমান টুপি-অলা হাতে পুরো দস্তানায় মানুষ লাঠি ঠুকতে ঠুকতে এগিয়ে আসছে। জোর পায়ে রাস্তা পেরুচ্ছি। ততক্ষণে দূরের গিরিশৃঙ্গে কে যেন সোনার মুকুট পরিয়ে দিচ্ছে। অনেক অনেকটা পথ পেরিয়ে এলুম। এখানে অথৈ নির্জনতা। কখনো কখনো নির্জনতা এত মুখর হয় এমন একান্ত সঙ্গী হয়ে ওঠে। এখনো এখানে কেউ এসে পড়েনি। ছমছম পাহাড়ের ধার ঘেঁষে গভীর গভীরতর খাদ। অনেকটা পথ হেঁটে এসেছি, একটু জিরোতে ইচ্ছে করলো। পথের ধারেই একটা পাথরের উপর বসে শরীফ মেজাজে একটা সিগ্রেট দুবার দেশলাইয়ে ঠুকে মুখে লাগাতেই ফিশফিশিয়ে কানের কাছে কে যেন বলে উঠলো—ম্যাচিস আছে? প্রথমে বুঝতে পারিনি ভেসে আসা অন্য কোনো শব্দে বলে মনে হচ্ছিল। মনের ভুল ভেবে ধরাতে যেতেই আবার সেই শব্দ—ম্যাচিস আছে? ......?

কে, কে আপনি? আপনি আমার সামনে কেন আসতে পারছেন না? কোন্ আদিম আড়ালে আপনি লুকিয়ে, আছেন? আপনি কে? কে কে আপনি? দূর খাদের গভীর থেকে শব্দ ভেসে এলো—কে আপনি আপনি কে কে—ই—কে—ই…। কিন্তু অ্যাতো খাড়াই খাদের নীচে ভয়ঙ্কর এক প্রতিধ্বনির মুখোমুখি হতে ভয় পেলাম। এখানে একা আমার আর থাকতে আমার সাহস হোলো না। আমি দ্রুত হাঁটিতে হাঁটতে কখন যেন দৌড়ুতে শুরুকরেছি।

যত আঁধার ঘনিয়ে আসছে ততই আমার চার দেয়ালের হাজার মুখ। আমার দেয়ালে, চারপাশের জানালায় আমার বিছানায় আমার শরীরে। অদিতি তুমি কি আমাকে একটু ঘুম দিতে পারো না? তুমি কি দেখতে পাচ্ছো না আমার সমস্ত শরীর জুড়ে জ্বর। আমার বুকের মধ্যে হাতুড়ির আওয়াজ আমার শিরায় শিরায় লাভার নদী বইতে শুরু করেছে। অদিতি এক সময় কখন যেন বলে উঠলো—আলোটা নিভিয়ে দাও। না-না, সে কি, আমি সুইচে হাত চাপা দিলুম। তুমি জানো না ও এখন এই ঘরের চারপাশে। অদিতি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিল। অদিতি আলোর মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েছে। আমার ঘুম আসে না। আমি কত কাল ঘুমাতে পারি না, সারা ছুনিয়ায় বুঝি আমিই একা জেগে। প্রভু তুমি কি আমাকে একটু ঘুম করুণা করতে পারো না। পারো না?

আমার সারা দেয়ালে দুঃস্বপ্ন।

আমার সারা শরীরে দুঃস্বপ্ন।

আমার চোখের পাতায় দুঃস্বপ্ন।

ওফ্, আমার অদিতির সারা অবয়ব ঘিরেও আমার দুঃস্বপ্ন। আমি দুটো রগ হাতের চেটোয় চেপে ধরলুম। ঘরের লাগোয়া ঝুল-বারান্দায় শীতে আমার শরীর জুড়িয়ে এলো। আমার চোখের সামনে থেকে ক্রমশঃই নিচু হয়ে যাওয়া বাড়িগুলোর মাথায় তারার আলো-গুলো পর্বতশৃঙ্গগুলোকে কেমন যেন রহস্যময় করে তুলেছে। রাতের পাহাড় যেন দিনের থেকে আরো অনেক মোহময়। আমি দরজাটা টেনে দিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ালুম। হেঁটে যেতে বেশ ভালো

লাগছিলো। পায়ে পায়ে অনেকটা পথ এগিয়ে গেলুম। বাঁকটা পেরোতেই আমার হোটেলের মাথা আর দেখা গেল না। আনমনে যখন পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে ধরাতে গিয়ে আচম্বিতে সেই মুখটা আমার ঠিক মুখের সামনে এক পলক থেমেই চোখের সামনে থেকে কুয়াশা হয়ে বেরিয়ে গেল। কুয়াশা না মেঘ? মেঘ না জমাট অন্ধকার? আমি নিশ্চিন্ত সিগারেটে টান দিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে ভাবলুম—ওর চোখ কি আমাকেই খুঁজছিলো? তাহলে ও কোথায়? পেছনে তাকিয়ে দেখি জমাট অন্ধকার আমার পেরুনো রাস্তা দিয়েই মিশে যাচ্ছে। এতক্ষণ বাদে মনে হল আমি অদিতিকে একলা ফেলে চলে এসেছি। উঃ সেই চোখ, সেই বীভৎস মুখ সেই প্রথম দিনের মতো চাহনি দেখেও চিৎকার না করে আমার হাত কামড়াতে ইচ্ছে করছিলো, আমার পাথরে মাথা ঠুকতে ইচ্ছে করছিলো। আমার সমস্ত চেতনা যেন অশরীরী আত্মা হয়ে দূরে সরে যাচ্ছে। আমি জোর কদমে ফিরে আসছিলুম। আমার ঠোঁট থেকে কখন সিগারেটটা খসে গেছে। আমার সমস্ত শরীর হিম হয়ে আসছিলো—আমি দৌড়ুচ্ছিলুম। ওর চোখের কোণে কি তখন সেই ভয়ানক জরুলটা কাঁপছিলো যেমন প্রথম দিন। অদিতি তুমি এখনো জেগে? তুমি কি দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছো। দূর থেকে আমার ঘরে জানালায় আলোটা কাঁপা কাঁপা মনে হলো। আমি চিৎকার করে উঠলুম—অ দি তি ই—। হোঁচট খেয়ে আমার বুড়ো আঙুলের ডগায় রক্ত জমে গেল। আমি দেখছিলুম—আমার ঘষা কাঁচের আলোয় একটা টুপি আর দুটো হাত এবং তার মুখটা প্রচণ্ডভাবে অদিতির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। অদিতি-ইঈঈ···। অদিতির সমস্ত শরীর আড়াল ক'রে ওর মুখটা ওর টুপি এবং···। অদিতির দুটো হাতে প্রচণ্ড বিদ্রোহ। ওকে ছাপিয়ে অদিতির দুটো হাত জানলার কাঁচে এসে ফিরে যাচ্ছে।

একলাফে দু'তিনটে সিঁড়ি পার হয়ে আমি প্রচণ্ড জোরে দু'হাত দিয়ে দরজায় ঘুঁষি মারলাম! অদিতি আমি ওর ভয়ানক মুখটা দেখতে চাই। আমার ঘুম, আমার ক্লান্তি, আমার যন্ত্রণা, আমার জীবন।

দরজা খুলে যেতেই আমার হাতের সামনে ভারী কিছু পেয়েই

ছুঁড়ে মারলুম। আয়নাটা দেয়ালে গিয়ে আছড়ে পড়লো।

লোকটা ?

লোকটা কোথায় ? জন্তুটা কোন্‌দিক দিয়ে পালালো। বরঞ্চ তুমি ঐ জানালাটা···।

অদিতি বিছানা থেকে নেমে মেঝের ছিটনো পারা-কাঁচ আঙুল ঘষে একটার পর একটা আলগোছে তুলে নিতে নিতে বললো—ও এসেছিলো, হয়তো এসেছিলো। কিন্তু দেখো, ও আর কক্ষনো আসবে না। আর শোনো তুমি একটা নতুন আয়না কিনে এনো। আর যদ্দিন না তোমার আয়না আসে তুমি আমার চোখের দিকে তাকিও।

সেই থেকে ওরা ভেবেছে ময়নামতী দীঘির সাদা পদ্ম দেখতে যাবে।

অদূরে বৃষ্টির শব্দ

হেড অ্যাসিটেন্ট জনার্দনবাবু টেবিল থেকে পোষ্টে আসা খামটা খুলে চিঠিটায় তাকাতেই টাইপ করা অক্ষরগুলো মৌমাছির মতো নেচে উঠলো। কলকাতায় সদর দপ্তরে ট্রান্সফার। বাব্বা এদ্দিনে মা মুখ তুলে চাইলো, চুলোয় যাক্ অফিস, টগবগে ঘোড়ার মতো বিদায় নিয়ে বাড়ির দিকে এগুতে লাগলো। সরকারী অফিসের ডিভিসনের হেড অ্যাসিটেন্ট জনার্দনবাবু।

মফঃস্বলের অফিস।

বড় রাস্তা পেরোলেই কোর্টের মাঠ, তারপর বাড়ুজ্যের হাট পেরিয়ে একটু এগুলেই ঘোষপাড়া। এটুকু পথ হেঁটে আসতে খানিকটা সময় লেগে যায়। প্রথম প্রথম বেশ কষ্ট হতো। এখন সময়টা একটা হিসেবের মধ্যে এসে গেছে। আসলে এখানকার গোটা সময়টাই যেন ডিস্ট্রিক জেলের ঘন্টির আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে পা ফেলে চলে! দীর্ঘ পনেরো বছর ধরে এই একভাবে কোর্ট পেরিয়ে বাড়ুজ্যের হাটের পাশ দিয়ে কাঁচা রাস্তা ধরে উনি ঘোষপাড়ায় এসেছেন, আবার পরের দিন ঠিক সময়ে জেলের ঘন্টির তালে তালে অফিস পৌঁছে গেছেন। রাম-কমলবাবুর সময়ের নড়চড় নেই, যেন রামকমলবাবুর যাওয়া-আসা ধরেই ঘড়ির ঘণ্টা বাজে।

কিন্তু আজ ব্যতিক্রম হল।

রামকমলবাবু আমবাগান দিয়ে শর্টকাট মেরে অনেক আগে বাড়ি পৌঁছলেন। রোজকার মতো অফিস-ফেরতা বাড়ি ঘুরে জুতো উঠোনে রেখে হাত-পা ধুয়ে না এসে সিধে সামনের দরজা খোলা পেয়ে দোর পেরিয়েই হাঁক পাড়লেন—শুনছোওওও…। সুরমা রুটি বেলতে বেলতে অসময়ে ডাক শুনে একটু অবাক হয়ে উত্তর দিলো—যাচ্ছি…।

শীগ্রী শোনো, কতা আছে।

সুরমা অবাক হল, কেননা সাধারণত রান্নাঘরের পাশে হাতঅলা চেয়ারটাকে টেনে এনে মুড়ি চিবুতে চিবুতে অফিস কাছারি হাট্‌বাজারের রাজ্যের খবর নিয়ে গেঁজানোই রামকমলবাবুর বরাবরের অভ্যেস। বেশ টিকাটিপ্পুনি দিয়ে রসিয়ে রসিয়ে বলে যান, ছেলেমেয়েরাও এসব শুনেই অভ্যস্ত। রুটিনের গরমিল দেখে রান্নাঘর থেকে সুরমা দেবী আঁচলে হাত মুছতে মুছতে এসে বললেন—কি গো শরীর-টরিল খারাপ হয়নিতো? অসময়ে বাবাকে দেখে ছন্দা নন্দা বেরিয়ে এলো।

সবার সামনেই চিঠিটা খুলে ছেলেমানুষের মতো পড়তে শুরু করলেন রামকমলবাবু। অর্ধেক পড়া হতে না হতেই স্কিপিং করার ভঙ্গীতে নন্দা দুবার লাফিয়ে নিয়ে বললো—ওফ কোলকাতা। ভাবতে পারছি না রে দিদি। তারপর ছন্দার দিকে ভ্রূকুটি করে বললো—তোরতো এবার পোয়াবারো কি রে দিদি, খবরটা কেমন লাগছে রে? নন্দা জানে দিদি চিঠির খবরে সবচেয়ে খুশী। সমীরদার কলকাতা থেকে আসাই হয় না। চাক্‌রী ফেলে আসা কি চাট্টিখানি কথা। সুরমা দেবী গলার আঁচল টেনে নিয়ে কপালে দু-হাত ঠেকিয়ে কার উদ্দেশ্যে প্রণাম করে বললেন—ভগবান তাহলে অ্যাদিনে মুখ তুলে চাইলেন। তারপর দুবার পেন্নাম ঠুকে বললেন—চলতো নন্দা রান্নাঘর থেকে টক্ করে খাবারটা নিয়ে আসবি।

আর একজন দরজার পাশে দাঁড়িয়ে সব কিছু দেখলো। তারপর সব শুনে নিঃশব্দে দরজা খুলে পায়ে পায়ে বাইরে বেরিয়ে পড়লো। সে জানে, তার কথা এখন কেউ শুনবে না। তার মতামতের কোনো দাম নেই। তার ইচ্ছে অনিচ্ছের উপর সারা পৃথিবীর রুটিন পাল্টাবে না। প্রতি-দিনকার ঝিলমপুরের ঝকঝকে সোনালী বিকেল কেমন যেন এক মুহূর্তে জণ্ডিস রুগীর মতে বিবর্ণ হলদে হয়ে গেল। অমু খিড়কী দরজাটা কোনরকমে টেনে দিয়ে জোরে হাঁটতে ···না প্রায় ছোটার ভঙ্গীতে একদমে ঘোষপাড়া পেরিয়ে গেলো। সন্তু কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছে কে জানে। ঘোষপাড়া পেরিয়ে বাঁ দিক ধরে খানিকটা এগুলেই রেল-লাইন, এই ছোট্ট মফঃস্বল আধা-শহরট চিরে

সিধে বেরিয়ে গেছে। ও সারসার স্লিপারগুলো লাফিয়ে লাফিয়ে পার হতে লাগলো।

সন্তু কাতাক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে।

সন্তু কি এখনো সেই মাঠের ধারে কৃষ্ণচূড়ার তলায়?

না আরো এগিয়ে কালভার্টের ওপর গিয়ে বসেআছে?

স-ন-তু কি?……

ও আরও দ্রুত শ্লিপারগুলো পেরিয়ে যেতে লাগলো। ওর মাথার ওপরে বর্ষার সজল মেঘ—সঙ্গে সঙ্গে চলতে শুরু করেছে। মাঠ ভিজে। মাটীর পুরেনো গন্ধ ও প্রাণভরে শুঁকে নিলো। ওর দুধারের গাছ-গুলোর সবুজ পাতারা একে অপরকে পাল্লা দিয়ে যেন প্রদর্শনীতে নেমেছে। বিকেলের ভিজে রোদ খাপ-খোলা তলোয়ারের মতো ঝকমকিয়ে উঠছে। রেললাইনের পাশের ঢালের জলে ধূসর মেঘের লুকোচুরি। স্লিপার পেরোতে গিয়ে দু একবার হোঁচট খেয়ে দূরে দেখলো ময়নাডাঙার মাঠে জোর খেলা চলছে; তারও দূরে মাঠের এক ধারে সেই সবুজ জামার সন্তু।

সন্তুউউ·· উ···

ঘুসঘুস করতে করতে বোঝা নিয়ে দূরের ইঞ্জিন এগিয়ে আসছে। ও নেমে কাঁচা রাস্তা ধরলো। ট্রেন পেরিয়ে যেতেই ওর গলার আওয়াজ দূরের অশ্বত্থ গাছ ছুঁয়ে প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে এলো। সন্তু এবার শুনতে পেয়েছে। ও জোরে হাত নাড়লো। সবুজ জামার সন্তু দূরের অশ্বত্থের ডালে যেন মিশে আছে। এইটুকু পথ এক ছুটে পার হয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে অমু কাছে আসতেই সন্তু বর্ষার মেঘের মতো মুখ ভার করে জিজ্ঞেস করলে—তুই কি রে? বললি না স্কুল থেকে ফিরে এসেই এক ছুটে চলে আসবি, এই বুঝি তোর আসা হলো—ক···ত···ক্ষ···ণ দাঁড়িয়ে আছি, আর কতক্ষণ বিকেল থাকবে বলতো। একে এই বৃষ্টি। কদ্দিন বাদে আজ রোদ উঠলো। অমু মাথা নিচু করে পায়ের বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে মাটি সরাতে লাগলো। যেন সমস্ত শরীরের যন্ত্রণা একটা আঙ্গুলে ভর করে প্রাণপণে গর্ত খুঁড়ে যাচ্ছে। অমু কিইবা বলতে

পারে। সারা পৃথিবীর দুঃখ ওর বুক জুড়ে, সারা পৃথিবীর যন্ত্রণা অমুর চোখে যেন শ্রাবণের মেঘ হয়ে জমে আছে। সন্তু বললো—কি রে, রাগ হল বুঝি। তোর না খালি কথায় কথায় রাগ। চল্ চল্, দেরী হয়ে যাবে। চরণবিল কি এইখানে? এক ঠেলায় সন্তু ওকে খানিকটা এগিয়ে দিল। এমন সময় সারা আকাশ জুড়ে ঢেউ-এর মতো এক ঝাঁক বালিহাঁস নিজেদের কথা শোনাতে শোনাতে আকাশের গায়ে ডানা উড়িয়ে চলে যেতেই সন্তু বললো—আচ্ছা, ওরা কোথায় যায় বল্‌তো। অমু বিজ্ঞের মতো জবাব দিল—কোথায় যায় আবার, বাড়ি।

বাড়ি মানে? বাসা বল্।

হ্যাঁ, বাসাই।

আচ্ছা, ওদের বাসা কোথায় বল্‌তো?

কোনো গাছেটাছে হবে।

ধ্যাৎ, বাবার মুখে শুনেছি, ওরা নাকি অনেক দূর থেকে একসঙ্গে আসে, আবার চলে যায়। অমু বললে—যাঃ সে তো চিড়িয়াখানার পাখি। আমি একবার চিড়িয়াখানায় গিয়ে দেখেছিলুম, কততো পাখি, সবাই গলা ছেড়ে ঝগড়া করছে। মামা বলেছিলো—ওরা নাকি অনেক দূর থেকে সেই সাইবেরিয়া থেকে পথ চিনে চিড়িয়াখানায় বেড়াতে আসে শীতে, আবার গরম পড়লেই চলে যায়। কথা বলতে বলতে ওরা রেললাইন ধরে অনেকটা পথ চলে এলো। সন্তু বললে, অমু তুই একসঙ্গে কটা লাফাতে পারবি। দুটো। আমি তিনটে। সন্তু বললো—দাঁড়া, আমি আগে দেখি।

হ'ল না।

অমু লাফালো। অমুরও হল না।

ঘরে ফেরা ডানা ভেজা হাঁস তাড়িয়ে, খোয়া তুলে দূরের জলে টিপ করতে করতে ওরা অনেক দূর চলে এলো। বনের ভিজে গন্ধ ওদের সারা শরীরে। মানিকপুরের বাঁক পেরোতে না পেরোতেই আবার মেঘ জমে এলো। বর্ষার মেঘ জমে, আবার সরে যায়। আকাশের উৎসবে সোনামেঘের লুকোচুরি খেলায় হঠাৎ আকাশ কালো করে বৃষ্টি নেমে আসতেই ওরা তাড়াতাড়ি লাইন পার হয়ে পাশের তেঁতুল গাছের তলায় এসে দাঁড়ালো। সারা আকাশে হঠাৎ কে যেন এক পোঁচ কালি

বুলিয়ে তাকে সাফসুতরো করার জন্যে জল ঢেলে দিল। দূরের মেঘ যেন বৃদ্ধ গুরুমশায়ের মতো চাবুক নাচাতে নাচাতে এগিয়ে এসে চোখ রাঙাচ্ছে।

বৃষ্টিটা ঝেপেই এলো।

গাছের গোড়ায় দাঁড়িয়ে ওরা শরীর বাঁচাতে চাইলো। প্রথমে বেশ ভালই লাগছিলো। দূরের মাঠটাকে কে যেন ধূসর রঙের চাদরে ঢেকে দিয়েছে। দূরের তাল নারকোল গাছের চেহারাটা মাঝে মাঝে আবছা হয়ে আবার স্পষ্ট হচ্ছে। ধানের তূষ ওড়ানোর মতো কে যেন বৃষ্টিটাকে কুলোয় ফেলে এদিক-ওদিক ঝেড়ে তুলেছে। প্রথমে উপরের পাতা বেয়ে টুপটাপ ফোঁটা মাথা বেয়ে কপাল গড়িয়ে মুখে পড়তেই হাতের চেটো দিয়ে মুছতে না মুছতেই আবার কপাল গড়িয়ে জল নেমে এলো। সন্তুর মনে পড়ে গেল, মা আজ বাইরে যেতে বারণ করছিলো। বেশ শীত শীত করছে, ওরা দু'জনে ঘেঁষাঘেষি করে গাছের গোড়ায় সরে এলো। ওরা দুজনে হাতের বেড়ে দুজনকে আরও কাছে টেনে নিল। ভিজে চড়ুইয়ের মতো দুজন দু'জনের ঘনিষ্ঠ তাপে বৃষ্টির চাঁদোয়ার তলায় জলের অর্কেষ্ট্রা শুনতে লাগলো। অমু মুখ ফিরোতেই কপালের জল মুছে নিয়ে বললো—কি হয়েছে রে তোর ? তোর বাড়িতেও বকবে, না রে ? অমু মাথা নাড়ালো, ওর গলায় সমস্ত কথা কান্না হয়ে জমে আছে। নিঃসীম বৃষ্টির চাদর খুলে অন্ধকার ক্রমশঃ পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে। ওরা আবার রেল লাইন ধরলো। সন্তু বললো—চ তাড়াতাড়ি হাঁটি, জামা ভিজে যা জবজবে হয়ে আছে, তোর শীত করছে না ? ওরা দুজন খানিক এগুতেই সন্তু বললো—দেখছিস অমু, তদ্দিন ভেবেছি ময়নাবতী যাবো তদ্দিনই বাধা, আচ্ছা আমাদের ময়নাবতী যাওয়া হবে না রে ? সেই কবে থেকে যাবো যাবো ভাবছি। সেই কঅবে ঠাকুমা বলেছিলো—।

সেই থেকে ওরা ভেবেছে ময়নাবতী দিঘির সাদা পদ্ম দেখতে যাবে। বর্ষায় অজস্র সাদা পদ্মে জল ঢাকা পড়ে যায়, ভ্রমরের ডানায় ভর করে সন্ধ্যে নামে। ঠাকুমা বলেছিলো—কখনো কখনো নাকি চাঁদের আলোয় ডানা মেলে আসে ফুলপরী। তার মাথায় কনকচাঁপা ফুল, গলায়

যুঁইয়ের মালা। ওরা ভেবেছে। কখন ওদের স্বপ্নে নেমে এসেছে চাঁদের আলোয় ফুলপরী। ফুলপরী আর ময়নাবতী, ময়নাবতী আর ফুলপরী। ওরা ভেবেছে আর ভেবেছে, যাওয়া হয়ে ওঠেনি। সন্তু এবার প্রতিজ্ঞা করে বসলো—দেখিস অমু—সামনের পূর্ণিমায় আমরা যাবোই যাবো, দেখি কে আমাদের যাওয়া ঠেকায়। এতক্ষণ বাদে সন্তুর মনে হল অমু কথা বলছে না, শুধু নিঃশব্দে একটার পর একটা স্লিপার ডিঙিয়ে যাচ্ছে বেড়ালের মতো।

কি রে কথা বলছিস না যে, তোকে খুব বকবে, নারে?

অমু মাথা নাড়লো। ও কি করে সন্তুকে বলবে যে, ওর বাড়ি যেতে একটুও ইচ্ছে করছে, না, একটুও না।

কিরে, যাওয়া হল না বলে তোর খুব মন খারাপ হচ্ছে না?

অমু মাথা নাড়লো না। অমুর দু'চোখে বর্ষাব ভিজে যুঁই। ও ধরা গলায় বললো—সন্তু, আমরা চলে যাচ্ছি রে। কথাগুলো কান্না হয়ে সন্তুর কানে আসতে ও অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো—কোথায়? স্লিপারগুলো থেকে চোখ না তুলে ও বললো—বাবার বদলীর অর্ডার এসেছে, আমরা কোলকাতায় চলে যাচ্ছি।

একেবারে? সন্তু ওর জামাসুদ্ধ হাতটা চেপে ধরলো। সন্তু যেন আর্তনাদ করে বললো—তোরা আর আসবি না এখানে? কে যেন সন্তুর মাথা টিপ করে আচমকা গুলতি ছুঁড়লো। সন্তু হাত চেপে বললে—তুই কি করে যাবি বল, তোর এখন স্কুলের পড়া কতো! সামনে পরীক্ষা। সন্তু খানিকটা সাহস পেয়ে বললো—অমু তুই থেকে যা, আমি মাকে বলবো. তুই আমাদের বাড়িতে থাকবি। মা তোকে কত ভালবাসে, বল? আমরা একসঙ্গে স্কুল যাবো। দেখিস বাবাও কতো খুশী হবে। তাছাড়া আমরা ময়নাবতী যাবো না? পাশ করেটরে তখন একেবারে কলকাতা যাবি। আমিও নয় তোর সঙ্গে ওখানে যাবো। সন্তুর চোখের কোণে কখন জল জমেছে। সন্তুর চোখ উদাসী বর্ষার মেঘের মতো সজল গভীর।

অমু বললে—বাবা আমাদের সব্বাইকে নিয়ে যাবে রে।

—তাছাড়া কলকাতা তো মাত্র একদিনের পথ। তোর বাবা

তো প্রায়ই যায়। কাকাবাবুকে বলিস যেন তোকে নিয়ে যায়, আমিও তোর সঙ্গে চলে আসবো, শুক্রবার যদি আসি শনি রবিবার থেকে আবার চলে যাবো। এই তো কটা বছর কাটলে তারপর তো কলকাতা, কলেজ দেখব দেখিস, সময়টা মনেই হবে না। তাই না সন্তু?

কেউ কথা বলছে না।

তুজনের চোখের পাশ থেকে ময়নাবতী দিঘী অনেক দূরে।

তুজনের পায়ে পায়ে পার হয়ে আসা স্লিপারগুলো ক্রমশঃই সরে যাচ্ছে।

তুজনের চোখেই বর্ষার মেঘ এখনই বুঝি বৃষ্টি নামবে।

ওরা আর কখনো একসঙ্গে নয়ন-ডাঙার মাঠ পেরিয়ে অশ্বথের তলায় যাবে না। অনেক দূরে সেই ময়নাবতীর জলপরী, মাথায় যার কনকচাঁপা গলায় যূঁইয়ের মালা। ভোরের শিউলির মতো ওদের স্মৃতিগুলো টুপটুপ ঝরছে তো ঝরছেই! শহর অনেক বড়, অত ভীড়ে অমুকে সন্তু খুঁজবে কি করে? আর খুঁজেই যদি পায় তখন সন্তুকে দেখে ওর ঝিলমপুরের কথা কি মনে পড়বে? অমুর হাত তুটো ধরে সন্তু গুমরে উঠলো। কে যেন তুটো বনটিয়াকে টেনে হেঁচড়ে খাঁচায় পুরে দিতে চাইছে। ওদের আর্তনাদ আর ওদের বুকের সবুজ পালক যন্ত্রণায় ঘুরে কোথায় সরে যাচ্ছে।

তখনো অদূরে বৃষ্টির শব্দ।

কিংবা বৃষ্টির শব্দ দূরে রেখে ওরা বাড়ির রাস্তায় নামলো।

হে চড়ানো গোড়ালির দাগটা যেন ভারতবর্ষের ম্যাপ

লাশ

গল্প লেখা হয়েছিলো ঘোর ইমারজেন্সীতে। ছাপাও হয়েছিলো তখন। যখন চারদিকে লাশ গুলি আর গ্রেপ্তার খুন আর তল্লাসীর নামে অত্যাচার।

পর পর দু দিন একটানা ঝিরঝিরে বৃষ্টির পর মাঘের শেষে একটু ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব হলেও ঠিক গরম জামা পরার মতো নয়। রোববারের ইস্তিরি-করা সকালে কলকাতা হলুদ রোদ্দুর গায়ে মেখে পায়েপায়ে ধোপদুরস্ত হয়ে রাস্তায় নামলো। রেস্টুরেণ্টগুলোর চেয়ারগুলো এ সময়ে খালি থাকে না, মালিক ধরেই নিয়েছে—এ সময়ে টেবিল ছেড়ে কেউ নড়বে না, ফলে ছাইদানে ক্রমাগত পোড়া সিগ্রেটের টুকরো জমে উপচে পড়ছে।

ততক্ষণে কানে কানে খবরটা পৌঁছে গেছে। পৌঁছোনোটা কোনো ব্যাপার নয়। নতুন ব্রিজের তলায় ছিটেবেড়ার উটকো রিক্সাঅলা ঠিকে-ঝি, তলার লোকদের ঝুপড়ীতে ততক্ষণে হৈ চৈ কান্নাকাটি কথাবার্তা। নতুন ব্রিজের তলায় ভিজে পাঁউরুটির মতো লাশটা কাল রাত থেকে পড়ে আছে। ইতিমধ্যেই ব্যাপারটা সবার নজরে পড়েছে, তার থেকে চাউড় হয়েছে বেশী। বোঝেনি তিন বছরের বাচ্চাটা, তখনো সে মায়ের বোঁটায় মুখ রেখে পরম নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে। যেমন রাতজাগা শিশুরা ঘুমোয়। কলকাতা। কলকাতার একপাশে বাস্তুহারা বাজার। বেশ জমেছে। পর পর মাংসের দোকানে লোহার আংটায় খাসি ঝোলানো। বাছাই-রাঙ্ থেকে মাংস বেছে নিচ্ছে খদ্দের। মাসের প্রথম দিক। দোকানে ভিড়টাও একটু বেশী। ছুরি দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে খোলা থেকে কচ্ছপের নাড়িভুঁড়ি ছাড়াচ্ছে বনমালী উড়ে। ব্যাপারটা সবাই জানে, এই নিয়ে বাজার গরম কিন্তু ওদিকে এখন গিয়ে সময় নষ্ট করার মতো সময় এখন কারো নেই। সেটা হবে একটু পরে। সময় করে নিতেই

হবে, কারণ আর যাই হোক মেয়েমানুষের শরীর তো! উটকো-বাজারে ওদিককার চত্বরে আলু কপি আর চালানি, নওলা, টাটকা ট্যাংরা কাটা পোনা, চন্দনা-ইলিশের পাশে গন্ধরাজ লেবুর দরদামের বাজারে ঠেলাঅলা রিক্সা, কালীঘাটের পুণ্যযাত্রী, সবাই প্রায় টুকটাক একের পর এক উড়ে এলো শকুনের মতো। ক্রমশঃই ভিড় বাড়ছে। এখন প্রায় ট্র্যাফিক জ্যাম হবার জোগাড়। ঝকঝকে একটা রোববার। বুদ্ধিজীবিরা এটা একটা উপরি পাওনা হিসাবে পেয়ে গেল। দেশ, সমাজ ব্যবস্থা, বিপ্লব, সরকার, নানা আলোচনার ফাঁকে একবার উদোম শরীরটাকে দেখে নিতে কারো ভুল হ'ল না। এরকম একটা অসভ্য-ব্যাপার বেশীক্ষণ চলতে দেওয়া যায় না। বাড়িতেও রান্নাবান্নায় আজ একটু সময় নেবে, সুতরাং তারা ঝোপঝোপ আলোচনায় বসে গেল।

রোজকার চায়ের দোকানগুলো ফাঁকা। এ সময়ে চারদেয়ালে থাকা যায়? সুতরাং ভিড় বাড়তেই শুরু করলো। পাশের চায়ের দোকানের মালিক পয়লা রোববারের জন্যে একটু বেশী মাল কিনে রেখেছিলো। প্রথম দিকেই ওমলেট টোষ্ট ঘুগনী চা'টা একটু বেশী কাটে। বেচারা ক্যাশবাক্সের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে কাঁচা একটা খিস্তি দিয়ে বললো—শালার মাগী, আর মরার সময় পেলে না, মাসের পেথ্থোম রোববারটা দিলে একবার বরবাদ করে?

এদিককার দোতলা তিনতলা বাড়িগুলো প্রায় লাগোয়া। জানলা খুলে বারান্দায় মেয়েদের আলোচনা শুরু হয়ে গেল। একজন বললো—একেবারে ন্যাংটো?

—তাই নাকি?

হ্যাঁগো শুনলুম—পোয়াতী?

কি করে জানলে ভাই?

—ওদের মধ্যেই কে যেন বললেন। একটা পুরনো কাপড় পাঠিয়ে দিলে হয় না? ছিঃ ছিঃ, এই ভদ্রলোকের পাড়ায়। কিন্তু কেউ নড়ছে না। রান্নাঘর থেকে ক্রমশঃ ডালপোড়ার গন্ধ আসতে শুরু করলো উনুনের আঁচ বয়ে যাচ্ছে।

এখন পূজো নেই, ফাংশন নেই। রকের ছোঁড়াদের একটা কাজ জুটে গেল। হঠাৎ জমে যাওয়া ভিড়ের খবর পেয়ে গেলেন লোকাল-নেতা। সংগ্রামী কর্মীরা খবর দিয়ে দিলেন তড়িঘড়ি। খবরটা পেয়েই তিনি ছুটে এলেন। এত অল্প সময়ে মাইক জোগাড় করা সম্ভব হোলোনা। চোঙা দিয়েই তিনি বলতে শুরু করলেন। পাশের 'বংশী ইলেকট্রিকে'র দোকান থেকে নেতাকে একটা নড়বড়ে টুল জোগাড় করে নিয়ে তার চার পা শক্ত করে ধরে রইলেন একজন।··· সংগ্রাম যে শেষ হয়নি, জনগণ বুঝলো।

ছুটির সকালে বিছানা ছেড়েই তিনি উঠে জম্পেস টান দিতে দিতে হাঁক মারলো শাআহ্‌লা, আরো চিল্লা, একটু দুঃখু দুঃখু করে বল্‌ বোকা। লোকের মনে দুঃখু না ঢোকালে ভালো প্যালা পড়েরে শালা। ওস্তাদের মেজাজ দেখে ওরা চটপট আরো গলা চড়ালো। বডির লাশ পুড়বে গরীবের মা বাপ, কিছু ছাড়ুন দাদা।

সব কিছু দেখে শুনে বাচ্চাটা ক্ষিদে তেষ্টা সব কিছু ভুলে শুধু অবাক হয়ে দেখছে। আশপাশের ভিড়। মায়ের মুখ চাপা দেয়া চাদরে এত পয়সা সব কিছু দেখে ও কেমন যেন বোবা মেরে গেছে। একটু ভয়ে ভয়ে দু' হাতের আলতো আঙুলগুলো দিয়ে ওর মাকে জড়িয়ে ধরলো।

তিরিশ বছরের লাশে ততক্ষণে মাছির উৎসব শুরু হয়ে গেছে। এ দেহে এখন খিদে নেই, তেষ্টা নেই। মরা মাছের মতো চোখে বাঁচার স্বপ্ন নেই, পাঁজরে শোক নেই, তাপ নেই, পেটের ভেতরে বাচ্চাটার লাথির শব্দ সে এখন আর শুনতে পাচ্ছে না। এখন ঘুম। অনন্ত নিশ্চিন্ত ঘুম।

লাশটাকে এক্ষুণি সরানো দরকার।

যা আশা করা গিয়েছিলো, তারা চেয়ে ঢের ঢের বেশী আমদানী হয়েছে। পাশেই মহাশ্মশান। হিসেবটিসেব করে দেখা গেল—চেনা-জানার মধ্যে ইলেকট্রিকে খরচাটা কম পড়বে। পয়সাগুলো নতুন থানে বেঁধে, পাশের শশ্মানে মড়াটাকে প্রায় হিঁচড়োতে হিঁচড়োতে ঘাটের

দিকে নিয়ে যেতে যেতে বিম্‌লে বাচ্চাটার দিকে একবার তাকিয়ে বললো দেখিস—বিচ্চুটা যেন আবার হাফিস না হয়ে যায়। যা শালা ওর জন্যে একটু দুধ নিয়ে আয়। এই শালাকে বাঁচাতে হবে তো।

পাশেই লাগোয়া মহাশ্মশান। খাট কেনার দরকার নেই। টেনে নেওয়া লাশটার হিঁচড়োনো গোড়ালির আঁকাবাঁকা দাগটা যেন ভারত-বর্ষের ম্যাপ বলে মনে হচ্ছিলো।

বেলা বাড়ছে। কবিতার কলকাতা, নাটকের কলকাতা, শিল্পীদের কলকাতার ভিড় এখন সরছে।

ঘুড়ির মতো চিল উড়ছে আকাশে। আকাশের গায়ে হলুদ বিছনো রোদ্দুর। পাশের গাছের কাঠামোয় কয়েকটা শকুন। খেল খতম। ভিড়ও আস্তে আস্তে পাতলা হয়ে গেল। শুধু ভিড়ের শেষে দুলকি চালে হেটে গেল সেই গরুটা, যার টানটান পেটে আলকাতরা দিয়ে কারা যেন লিখে দিয়ে গেছে—কলকাতা—৭১।

পুত্রেষ্টি

কলকাতার ঘুম নেই। প্রথম প্রহরে যখন ঘুমিয়ে পড়ে মহানগর তখন পাশাপাশি জেগে ওঠে আরেক কলকাতা। এই কলকাতার ক্লান্ত দেহের ওপর যখন ভামিনী রাত উপুড় হয়ে আছে, তখন শহরের এক কোণে এক নার্সিংহোমের ছোট ঘরের জানলার শার্সিতে আছড়ে পড়লো কান্নার শরীর, ছড়িয়ে পড়লো করিডরে, চিৎ হয়ে পড়ে থাকা পাশের অ্যাসফল্টে। তার হাতে পড়লো দড়ির গায়ে টিকিট। অচেতন মায়ের দেহটার পাশ থেকে বুকে তুলে নিলো মাসী। জন্ম হল পৃথিবীর নতুন একটা নম্বর। নতুন শৈশব। যার মালিক এখন অতনু।

রাত প্রায় হাল্কা হয়ে আসছে।

সারাদিন ঝড়ের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে ক্লান্ত নাবিকের মতো তীরে তরী ভিড়িয়ে নীরব নিশ্চিন্ত ঘুমের মধ্যে ডুবে আছে তপতী। পাশের ঘেরা খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে অতনু দু' মুঠোয় মাথার চুলটা টানটান করে ঘুম ভাঙা বেড়ালের মতো ছাড়িয়ে নিল শরীর। ঝড়ো-ক্লান্তি। ক্লান্তিকর একটা তৃপ্তিস্রোত কেমন একটা ঘুমের আবেশ ছড়িয়ে দিচ্ছে সমস্ত শরীরের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে। এত রাতে কোথায় যাবে অতনু ? এটুকু রাত দেখতে দেখতে পুইয়ে যাবে। প্রথম বাস শহরে কখন বেরোয় ? অতনু আন্দাজ করার চেষ্টা করার সঙ্গে সঙ্গে হুড়ুম করে দরজা খুলে বেরিয়ে এল ডাক্তার। ঐ করিডরটুকু পেরিয়ে দোতলা থেকে একতলার সিঁড়ি ভাঙতেই তার কপালে বিন্দু ঘাম জমে গেছে। রুমাল দিয়ে চোখ কান মুখ ঘষতে ঘষতে গাড়ির স্টিয়ারিং এ হাত রেখে কথা ছুঁড়লো ডাক্তার—বাড়ি যান নি ?···

—এই যাবো। এবার অতনু একটু তুতলিয়ে জিজ্ঞেস করে—পেশেন্ট কেমন আছে ডক্টর চ্যাটার্জী। সিগ্রেটে আগুন লাগিয়ে কাঠিটাকে নাড়াতে নাড়াতে এক টোকায় ছুঁড়ে ফেলে ডাক্তার বলে

—ওককে—ওককে···বোথ আর কোয়াইট ওকে। মিঃ মিত্র, বায় দা ওয়ে আমি ওষুধপত্তরের চার্টটা সিস্টারের হাতে দিয়ে এসেছি। ইচ্ছে হ'লে কিনে দিতে পারেন, তা না হলে নার্সিংহোমই কিনে নিয়ে পরে বিলে অ্যাডজাস্ট করে দেবে। কাল থেকেই বেবির জন্যে ফুডের ব্যবস্থা করুন। হেডলাইট জ্বালিয়ে হুস্ করে বেরিয়ে গেলেন ডঃ সমীর মুখার্জী। ডাক্তার বেরিয়ে যেতেই মনে হ'ল কেবিনে একবার যাওয়া যায় না, তপতীর কাছে? সে তো সে। অতনুরই একজন। তবু সব কিছু ছেড়ে একটুকুর জন্যে তপতীর ঘরে যেতে ইচ্ছে করছিলো। অন্ততঃ একবার। তপতী কেমন আছে ওর কাছে গিয়ে কপালে হাত ছুঁয়ে একটু কথা বলা। কিন্তু সব ইচ্ছেই নিয়ম দিয়ে বেঁধে রাখছিল সময়। মাঝে মাঝে এই সব বিধিনিষেধের বেড়াজালগুলোকে ছিঁড়েখুঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে করে।

হঠাৎ রাগটাকে সহজ সরল করে নেয় অতনু, ওরা যা করছে তা তো তপতীর জন্যেই। ভাবতে ভাবতেই মনে হ'ল থাক্। ও তো ভালোভাবেই আছে। ওরা তো ভালোই আছে।

কেমন আছো তপতী?

কেমন আছো তোমরা? ভাল থাকো। ঘুমোও। ও নয়, ওরা।

কেমন দেখতে হয়েছে ষোলো নম্বর কে। নিজের দিকে তাকিয়েই একরা স্বগত উচ্চারণ করলো অতনু। ছেলেটাকে নার্সিংহোমের মাসীর কোলে একবার মাত্র দেখেছিলো অতনু। এখন আর কিছু মনে পড়ছে না। মাসীর কোলে লেপ্টে আস্টেপৃষ্ঠে জড়ানো নরম তুল্‌তুলে মাংস-পিণ্ডটার চোখ মুখ অবয়ব কিছুই মনে পড়ছে না। সব কিছু মিলিয়েই তখন ছিল অতনুর আরেক উত্তেজনা। নতুন এক স্বাদ। বাবা হবার এক অদ্ভুত শিহরণ। এরকম অনুভূতির মুখোমুখি অতনু এর আগে হয়নি। অথচ আশ্চর্য যে শিশুটি আলো দেখার জন্যে প্রতি নিয়তই অন্ধকারে যুদ্ধ করে যাচ্ছিলো, সেই নবজাত পৃথিবীর কোলে এসে তীব্র চীৎকার আর আর্তনাদে মুঠো করা হাত তুলে প্রতিবাদ কেন? কান্না, কি প্রতিবাদ? আকাশে মেঘের ওড়াউড়ি বাতাসে গুমোট ভাব, অতনুর কপালে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম জমছিল, অতনু

ওকে কি সেভাবে দেখেছে ? না তপতীকে। নাঃ, এ মুহূর্তে ভাববার আর অবকাশ নেই। এখন যতটুকু স্মরণে ছিল, এখন চেষ্টা করেও ১৬ নম্বরের মুখের আদল ঠিক মনে আসছিল না। হয়তো কারুরই আসেনা। ভাবতে ভাবতে সিগ্রেটের ছাইটা ঝরে গিয়েছিল, এখন আরো ছোট হ'য়ে হাতে ছ্যাঁকা লাগতেই অতনু আলটপকা চিন্তাগুলো এই মুহূর্তে ঝেড়ে ফেলে দিতে চাইছিলো।

ভিসিটার্স রুম।

নাঃ তেমন কোন ঘর নয়। একফালি বারান্দাকে আড়াল ক'রে, ছোট্ট গদি দিয়ে বসার মতোন ক'রে মোড়া। তিনদিকের দেয়াল লাগোয়া। একেবারে কোলাপসবিল গেট দেওয়া, নার্সিংহোমের সদর দরজার পাশেই।

অন্যদিন হয়তো অতনুর মতো একা না হলেও কেউ কেউ হয়তো থাকে। বিনিদ্ররজনী যাপন করে। আজ আর কেউ নেই। কেউ থাকলে হয়তো ভালো হ'ত। প্রহর গোনা মানে, উৎকণ্ঠিত মুখ, প্রহর গোনা মানে যন্ত্রণার অপেক্ষা। কারো আনন্দ, কারো বা দুঃখ। কারো বা দায়বদ্ধতা। অতনু কোন্ পর্যায়ে পড়ে ? অতনু নিজেই হাসলো। উৎকণ্ঠা ? আনন্দ, দায়বদ্ধতা ?

অখণ্ড নীরবতা চার দেয়ালে থমকে আছে। যাদের কথা এতক্ষণ ভাবছিলো অতনু, তারা এখন গভীর ঘুমে বা আচ্ছন্নতায়। ভিজিটার্স-রুমে সিলিং এর ওপর থেকে ঝোলানো তার থেকে নেমে আসা শেড দেওয়া ষাট পাওয়ারের একটা ডুম। আশপাশের ভয়ঙ্কর নিস্তব্ধতা। আলোটা বাতাসে দুলছে, হাওয়ায় দুলছে এপাশ থেকে ওপাশে। যেন চারপাশের গাঢ়-অন্ধকারের ব্যূহকে অভিমন্যুর মতো সরিয়ে দিচ্ছে। দিলে কি হবে, অন্ধকার আবার তার চারপাশ অক্টোপাশের মতো ঘিরে ধরছে। একা আর সমবেত লড়াইটাকে অতনু বেশ উপভোগ করছিলো। ডুমটা কখনো দুলছে এপাশ থেকে ওপাশ আবার ওপাশ থেকে এপাশ। যুদ্ধ বেশ জমে উঠেছে সংগ্রাম চলছে। চলবে। সংগ্রামের যেন শেষ নেই।

সিগ্রেটের ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে সিলিংএ গিয়ে জড়ো হচ্ছে। একটু ঘুমঘুম ভাব, ক্লান্তি, ক্রমশঃই জড়িয়ে ধরছে অতনুকে, বন্ধ দরজার ওপাশ থেকে টুকটাক টুকটাক ঘোড়ার খুরের আওয়াজ তুলে হাইহিলের শব্দে মিশে যাচ্ছে সিস্টার। মিশে যাওয়া শব্দটা কান পাতলে করিডরের শেষ অবধি শোনা যায়।

রাস্তার ওপারের ফুটপাতে কখন থেকে গোঙাচ্ছে একটা কুকুর।

রাতের কান্না এত নির্মম, এত অসহায়।

বাইরের সঙ্গে সুর মিলিয়ে মাঝে মধ্যে এ বাড়ির কান্নার ঐকতান ছড়িয়ে পড়ছে অন্ধকারে।

১৬ নম্বর কি এখনো জেগে নাকি?

সব কান্নাই এক। এক সুরে বাঁধা। তবু কান পেতে কিছু ঠাহর করার চেষ্টা করলো অতনু। নাঃ, কারো শব্দই চেনা মনে হচ্ছে না, তবু ওদের মধ্যে, কারো নম্বর হয়তো ষোলো, যেন মনে হ'ল সমস্ত কান্নার স্বর, একসঙ্গে ১৬ হ'য়ে অতনুর মাথায় ঘা মারছে।

একবার···

দু'বার···

বারবার···

ওফ্, ভগবান অতনু চীৎকায় ক'রে উঠলো—হ্যালো সিস্টার, ম্যাডাম, ষোলো টাকার নাইট ডিউটির রোজের মাসী, হ্যাল্লো হাউস-সার্জেন, তোমরা কি সবাই ঘুমিয়ে পড়েছো, তোমাদের কি ঘুম আর ভাঙবে না? শব্দগুলো উচ্চারণ হয় কিন্তু আওয়াজ হ'য়ে বেরোয় না, গলায় আটকে থাকে। শুধু একা অভিমন্যু লড়ে যায় ঝোলানো ডুম হ'য়ে, আর দরজার ওপার থেকে টুকটাক ঠুকঠাক আওয়াজ আসে, আবার মিলিয়ে যায়। সিলিংএ অতনুর ধোঁয়াটা জমাট বেঁধে থাকে। ডুমটা এখনো দুলছে—নিস্তব্ধ, নিঃসঙ্গ এই রাতে।

রাতেরও একটা কথা আছে। তারও হৃদপিণ্ডের শব্দ শোনা যায়।

আশ্চর্য, ঠিক এই সময় স্বপ্নময় রাতে যখন নিজের নিঃশ্বাস নিজে শুনতে পাচ্ছে অতনু, তখনই ভারী দরজাটা আস্তে আস্তে যেন খুলে

গেল। ইণ্টারলকড্ দরজাটার দিকে চমকে তাকালো অতনু। এই সময় কে ডিঙোবে বিশাল চৌকাঠ ?

তারপর আস্তে আস্তে চাপ দিয়ে কোলাপসিবল গেটটাও ছোট হ'য়ে গেল একজন মানুষ বেরুবার জায়গা নিয়ে।

কে ? গেট খুলে আসছে।

কে হে ?

মাথা বুক আর আঙুলগুলো নড়ে উঠলো অবশেষে শরীর। এ কে ? অতনুর শিরদাঁড়া বেয়ে ঠাণ্ডা হিমবাহ স্রোত হয়ে নিচে নেমে এলো—কে তুমি ?

পায়ে পায়ে অদ্ভুত শিশুটি অতনুর সামনে এসে দাঁড়ালো।

—আমায় চিনতে পারছো না বাবা ?

কি আশ্চর্য,—কে তুমি ?

মাসী ওকে দেখাবার সময় চিবুকের একটা তিল লক্ষ্য করেছিল অতনু। কিছুই বলা হোলো না শব্দগুলো বোবাকান্না হয়ে গলায় আটকে রইল।—চিনতে পারছো না বাবা।

—বাবা ?

—ছাখো, শিশু তার হাতটা বাড়িয়ে দিল। আলোয় ঝকঝক ক'রে উঠলো—ষোল নম্বর। ষোলো ? আর্তনাদ করে উঠলো অতনু,—কি আশ্চর্য, তুমি ষোলো ? বেড থেকে ? সিস্টার, মাসী আয়া তোমরা কি কালঘুমে পড়ে রয়েছো ? তোমরা কি পৃথিবীর কোনোই শব্দ শুনতে পাচ্ছো না ?

ষোলো নম্বর ফেরার। তোমরা বেঁচে আছো তো ? অতনু ফোমের গদ্দিতে নৃশংসভাবে ছুহাতের নোখ বসিয়ে দিল। ততক্ষণে ষোলো অতনুর মুখোমুখি হ'ল।—আমাকে চিনতে পারছো ?

হ্যাঁ, ন্না, মানে, অতনুর গলার স্বর জড়িয়ে আসছে, কেন চিনতে পারবো না বাবা,

—বাঃ, ভারী সুন্দর বাবা বলে ডাকলে তো।

—হ্যাঁ। তাইতো। তুমি আমাদের রক্তমাংসে গড়া ভালবাসার স্বপ্ন। আলোকিত একমাত্র ভবিষ্যৎ। আমাদের প্রার্থনা।

—ভালবাসা! চৌদিক কাঁপিয়ে শিশু আল্‌সে কাঁপিয়ে হেসে উঠলো, তোমাদের ভালবাসার আলোয়ান আমাকে এভাবে জড়িয়ে রেখেছে বলেই কি এত জ্বালা? পুড়ে যাচ্ছে, জ্বলে যাচ্ছে আমাদের শরীর। এই ছাখো, বলে যন্ত্রণায় মুচড়ে উঠলো দেহ। প্রচণ্ড এক বিষাদের কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে আছে ভবিষ্যৎ। বাবা, তোমরা কেন আমাকে আনলে।

কেন? আমাদের ভালবাসা তোমা'ক জড়িয়ে রেখেছে তিল তিল করে। আমাদের স্বপ্ন ফুল হ'য়ে বেড়ে উঠেছে। তুমি বেড়ে উঠেছো আমাদের গভীর মমতায়। লালনে। আমরা জাগরনে নিদ্রায় তোমারই প্রতীক্ষায় ছিলাম। প্রতিটি পল ছিল তোমারই মুহূর্তের জন্যে।

—একান্ত আমার জন্যে এই আমিকে তো চাওনি। কেউই চায় না। শুধু একটা চষা শরীরের ফলের জন্যে বিনীত ভীরু অসহায় চাষীর মতো অপেক্ষা, তোমরা অপেক্ষা কর। তা একান্তভাবে এই আমার নির্দিষ্ট এই স্পষ্ট শরীর নয়। আমার আদলে অন্য কেউ, অথবা অন্য কারোর বদলে এই আমি। ধরো বিকলাঙ্গ, কানা, অদ্ভুত একটা শরীর নিয়ে এলে কি তোমাদের এই মায়া-মমতা এবং তোমার ঐ ভালবাসা কি এমনিএকই-ভাবে অটুট হয়ে থাকতো? এভাবে বুকে টেনে নিতে পারতে বিকলাঙ্গ এক লুব্ধ আদল? পৃথিবীতে তাও তো হয়। তার জন্যে অনন্তকালের পাপ বয়ে নিয়ে চলে এই নম্বর-মাপা শরীর। জিওল মাছের মতো ঘেরাটোপে অনন্তকালের দুঃখ নিয়ে বেঁচে থাকতে হত। বলো বাবা, আমার এই হাতে লটকানো ষোলো নম্বরের টিকিটটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আরো কয়েকটা নম্বরের নির্মম ভিড়ে মিশে গেলে তোমরা কি আমায় খুঁজে নিতে পারতে? যদি ছিঁড়ে ফেলি।

না—আ—আ, অতনু চীৎকার করে ওঠে। অতনুর আর্তনাদ, নাকি অসহায়ত্ব। জলভরা মেঘের মতো আকাশে গুড়গুড় করে ওঠে—না বাবা ঐ কবচকুণ্ডল তুমি ছিঁড়ো না। ওই তোমার আসল পরিচয়. আমাদের নিজস্ব দুঃখ, সত্তা, অস্তিত্বের একান্ত অধিকার-নামা। যার অপেক্ষায় আমরা ঘেরাটোপে ছিলাম।

সেতো যে কোনো মানুষের অপেক্ষায় তোমরা থাকতে। একান্ত এই আমারই জন্যে নয়। আমরা কেউ কাউকে চাইবো বলে চাই না। আমাদের সবার মনে যে স্বর্গ খেলা করে, তাই পেতে চাই। আমরা কোনো চেনা আদলে আসিনা। এসে পড়ি ঘটনায়! জরুলের মতো।

—কিন্তু ছাখো, তোমার মা কিভাবে তোমায় রক্তের মধ্যে লালন করেছেন। তোমার নড়াচড়ার শব্দ কান পেতে অনুভব করেছি। আলগোছে তোমার হৃদপিণ্ডের তাপে নিজেকে উষ্ণ করেছে। তুমি যখন নিশ্চিত এক আঁধারের মধ্যে ঘুমে, তখন তোমার আসার পদশব্দে জননী প্রহর গুনেছে। দিন থেকে রাত, রাত থেকে দিন, সকাল গড়িয়ে আরেক সকাল।

সে শিশু কখন যেন অতনুর মাথায় মাথায় এসে দাঁড়িয়েছে। অতনুর চোখে চোখ রেখে বললো—বাবা, সে তো কর্তব্যবোধ। যে কোনো মা বা রমণীও কি তার অবাঞ্ছিত সন্তানের মমতায় শিউরে ওঠে না।

১৬ নম্বর ক্রমশই বড় হ'য়ে উঠেছে। আরো আরো বড় হয়ে গোটা নার্সিংহোমে সিলিং ছাপিয়ে মাথা ছাড়িয়ে কড়িকাঠের কাছে।

আশ্চর্য, তুমি এত বড় হয়ে গেছ, অতনু তার হাঁটুর কাছ থেকে মাথা উঁচু করে তার মুখের দিকে তাকিয়ে চীৎকার করে ওঠে —সিস্টার···।

—বাবা তুমি আমাকে ভয় পাচ্ছো? কথাগুলো হাওয়ায় গুমগুম করে ভেসে আসে···।

না, না। অতনু চীৎকার করে বলে উঠলো। না, তোমাকে ভয় পাই না, কারণ তুমিই আমার সেই গোপন নদী, যা আমাদের রক্তের মধ্যে অহরহ বয়ে চলেছে। কারণ এভাবেই পৃথিবী, মানুষ, সৃষ্টি, স্থিতি লয়। এই বিরাট ঢেউয়ের গর্জনে আমরা অসহায়। অতনু আস্তে আস্তে কখন ছোট শিশু হয়ে তাকিয়ে আছে কড়িকাঠে। সেই

শিশু কড়িকাঠে মাথা ঠেকিয়ে তলায় মাটির দিকে চোখ নামিয়ে মেঘের গুরু গুরু শব্দ ছড়িয়ে দিচ্ছে হাওয়ায়—

—বাবা, আমিও ঠিক তোমার মতো অসহায়। এই দীর্ঘ ক্লান্ত এক জীবনের ভার বয়ে আমি চলেছি। আমার সামনে কালো পাহাড়ের মতো সময় দাঁড়িয়ে। আমাদের দু'হাত নিংড়ে ফেলেছে বিষাদ। ভয়াবহ জীর্ণতার মুখোমুখি এক স্থবির মাটির উপর দাঁড়িয়ে এই আগামী, এই আমি, অনাগত কাল।

সে শিশু কড়িকাঠ ফুঁড়ে বাইরে চলে যাচ্ছে।

অতনু বেবিরুমের আরেক শিশুর মতো তার গোড়ালির পাশে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে ওঠে—কিন্তু বাবা তোমাকে তো আমি ও দেখতে পাচ্ছি না। আমি যে তোমার মুখ দেখছি না।

কড়িকাঠের ওপার থেকে সে শিশুর শব্দ হাওয়ায় ফিরে আসে—বাবা, আমিও তো তোমায় দেখতে পাচ্ছি না। অতসী তুমি এখনো ঘুমিয়ে? পৃথিবী তুমি কি এখনো ঘুমিয়ে? হে আমার আত্মজ তুমি এভাবে পৃথিবীর ঘুম ভাঙাবার অধিকার কোথায় পেলে। হায় ১৬ নম্বর! হায় অনাগত কাল। এখন শুধুই অন্ধকার।

দুজনের শব্দ যেন ধ্বনি থেকে প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে এলো।

আমাদের প্রত্যেকের হাতে একটা ক'রে রিভলবার ছিল।

কুকুর হইতে

সমীরণের পুরনো অভ্যেসটা এখনো বদলালো না। নাঃ, যা পাল্টে যাবার তা হয়েছে। কিন্তু সব অভ্যেস কি আর পাল্টানো যায়? পোষাক-আসাকে সেই হ্যাণ্ডলুমের পাঞ্জাবী, চপ্পল, পাজামার তলাটা ধুলোকাদায় এমন অবস্থা হয়েছে যে হাজার লণ্ড্রী থেকে এলেও ওর রঙ পাল্টাবে না। সমীরণের আরও একটা বদঅভ্যেস, লণ্ড্রী থেকে পাটপাট ক'রে আনা জামাটামাকে ইচ্ছে করেই একটু খুচমুচে করে দেয়া। ওর ভালোলাগার মধ্যে একটা জিনিষ—হাঁটা। এমনি একা একা আনমনে মানুষজন দেখতে দেখতে হাঁটা! হাঁটতে হাঁটতে কতরকম মানুষ দেখা যায়। বেশ মজা লাগে।

ওর পাজামা পাঞ্জাবী পড়ার ছিরিছাঁদ দেখে মা মাঝে মধ্যে ভাঙা গলার স্বর একটু উঠিয়ে বলে—তোর গায়ে কি পাটভাঙা জামাগুলো কামড়ায়? কতো সব ভদ্দরলোকদের বাড়িটাড়ি যেতে হয়, অর্থাৎ বড়লোকদের বাড়ি যাওয়ার সঙ্গে কাপড় জামার যে একটা অদ্ভুত সম্পর্ক আছে, সে-টা মা-ও জেনে গেছে। মায়ের কথা শুনে সমীরণ হাসে। আগেকার সেই হাসি নয়, যে হাসি হাসলে কড়িবরগা অবধি কেঁপে উঠতো।

একবার কফি হাউসে কি একটা কথার ওপরে সমীরণ হঠাৎ এত জোরে হেসে উঠেছিলো যে আশপাশের বেশ কয়েকটা টেবিল তাদের পুরো কথা থামিয়ে বেশ কয়েকমিনিট ওর মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়েছিলো। এখন ও আর সেই হাসি ও হাসেনা, ভুলে গেছে। এখন ঠোঁটের কোণায় যতটুকু আনা যায়, ঠিক ততটুকুই। আজকাল ওর হাসির মতো কথাগুলোও মাপ মতোন বাঁধা হয়ে গেছে। তাছাড়া ও আর বিশেষ কার সঙ্গেই বা কথা বলবে। কি নিয়েই বা বলবে?

তখন কথার ঝড় বইতো। প্রেসিডেন্সীর তুখোড় ছাত্র। শিরায়

টগবগ করে রক্ত বইছে। ওরা ইচ্ছেমতো ক্লাস করতো। ক্লাস ক'রে কি হবে? কি হবে এই পুঁথিপড়া বিদ্যে দিয়ে, এই সব শিক্ষাব্যবস্থার কতটুকুই বা বৃহত্তর সমাজ ব্যবস্থার কাজে লাগবে? ওরা সন্ধ্যে নাগাদ জুটতো একসঙ্গে অশোকনগরের ভাঙা মন্দিরটার কোণায়, এদিকটা খুব একটা কেউ আসে না। গোপনে সব বইটই-এর দেওয়া নেওয়া চলতো। চোখে তখন অন্য রঙ, বুকের মধ্যে ভীমরুলের মন্ত্র বোঁ বোঁ ক'রে ঘুরছে। নিজেদের নামগুলো নিজেরাই ইচ্ছেমতো পাল্টে নিয়েছে। তপন হয়েছে —টম, সমীরণ—গোর্দান। প্রীতিশদার নাম—রাজা, লীডার। কোথায় কি করতে হবে, কখন যেতে হবে প্রীতিশদা না বললে তা তালিম হবে না। পুলিশ অবশ্য আরো ঘোড়েল, আসল নকল সব নামই টোকা আছে আলাদা খাতায়। ছেলেরাতো আছেই, মেয়েরাও, এমনকি শীলা, তপতী অবধি, মন্দিরে না গেলেও গোপন খবরগুলো বাড়ি গিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসতো। বিপ্লবের কাজই ছিলো খেয়ালের। বিপ্লবের নজর রাখার দায়িত্ব কিন্তু অভ্যেস—ঘুমিয়ে পড়ার। ঘুমোনোই বিপ্লবের অভ্যেস, তার ওপর হাঁপানির টান একটু শেক না দিলে ও সব তাজা থাকে না। ওকে জাগিয়ে রাখতে হয়। বিপ্লব— নজরদার।

সমীরণের মায়ের হার্টের অসুখ। বেশী উত্তেজনা এলে বেচারা কাহিল হয়ে পড়ে। ছোটভাইটার অনেকদিন থেকেই শ্বাসের কষ্ট, অনেকদিন হোমিওপ্যাথী ক'রেও কিছু হয়নি; অপারেশন ছাড়া কিছু হবারও নয়, সমীরণ জানে। কিন্তু সে এক এলাহী ব্যাপার। সমীরণের সে সাধ্যিও নেই, তাই ও ঐ প্রসঙ্গটাও এড়িয়ে চলে। দিদি একটা প্রাইমারী স্কুলে কাজ পেয়েছে। কিছু আসে। একমাত্র সমীরণের দাদা বেড়ালের শিকে ছেঁড়ার মতো আধা-বিলিতি কোম্পানীতে ভালো কাজ পেয়েছে। বাবা, দাদাকেই মানুষ করে দিয়ে চলে গেছেন, কিন্তু দাদার এখন যা হাবভাব পাল্টাচ্ছে তাতে এ কলোনীতে বেশীদিন থাকবে বলে মনে হয় না। সমু, মানে সমীরণ এখন বাড়ির একটা 'কারন' হয়ে দাঁড়িয়েছে। দাদা মাকে প্রায় লাষ্ট-ওয়ার্নিংএর মতো জানিয়ে দিয়েছে, সমু এসব চালালে তার পক্ষে এখানে

থাকা অসম্ভব। এটা যে আগে থেকে একটা গাওনা, তা প্রায় বাড়ির সবাই বুঝে গেছে।

বোঝাবে কে?

পেটো বাঁধা হচ্ছিলো পোড়ো মন্দিরের ভেতরে। দড়ি সব ভেজানোই ছিলো। বাঁধা বোমার থলেটা পাচারও হয়ে গিয়েছিলো। তড়বড়িয়ে শেষটা বাঁধার সময় দড়ির মুখটা পিছলে একেবারে মেঝেয়। সমীরণের হাতের কনুই পর্যন্ত উড়ে গিয়েছিলো। সেই অবস্থায় ট্যাক্সি ক'রে সিধে বঙ্কিমদার নার্সিংহোমে। বঙ্কিমদার কাছে কোনরকমে পৌঁছুতে পারলেই নিষ্কৃতি। এসব কেস বঙ্কিমদাই ম্যানেজ ক'রে দেয়, কিন্তু সমীরণের তো সিরিয়াস ব্যাপার। এক্ষুনি অপারেশন। কিছুদিন এখানেই থাকতে হবে, তারপর আরো বেশ কিছুদিন। সমীরণ এ-সবের কিছুই জানেনা, অজ্ঞান হবার আগে ও শুধু একটা কথাই বলেছিলো—আমার হাতটা জোড়া লাগবেতো বঙ্কিমদা? তারপর আর কিছুই মনে নেই। তারপর কখন যে সমীরণ ধানবাদে কাকার কোলিয়ারীর কোয়ার্টারে চলে এসেছে, সে কথা আবছা মনে পড়ে। বঙ্কিমদা বলেছিলো—আমি ওখানে গিয়েই সমুকে দেখে আসবো। ধকল যা যাবার দিদির ওপর দিয়েই গেছে। ভাগ্যিস দাদা অফিসের কাজে ক'লকাতার বাইরে ছিলো। মাকে দিদি বুঝিয়ে দিয়েছিলো কাকার ওখানে সমীরণকে বেড়াতে পাঠিয়েছে, কিন্তু সমীরণ যখন ফিরলো? সমীরণকে বাড়িতেইতো ফিরতে হয়েছে।

ওসব এখন পুরোনো গল্প। সমীরণের সে সব দিনের কথা ভাবলে এখন হাসি পায়। এখন সমীরণ, আর দশটা সমীরণ। শুধু বাঁ কাঁধটা হাল্কা লাগলে, ভুরুতে হাত বুললে, গভীর দাগটায় ছোঁয়া লাগলে আচমকা চোখটা জ্বালা ক'রে ওঠে। কে যেন বুকের ওপর বিড়ির আগুনটা চেপে ধরে।

সমীরণের কোনদিনই চাকরী হবে না। তা না হোক, বাকী সবাইতো কেমন সুন্দর আছে। 'ভালো থাকো কমরেড স·········' আচ্ছা, সমীরণ নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করে—ওদের কি একবারের জন্যে পুরোনো

কথা মনে পড়ে না ? ঝুল-পাঞ্জাবীর হাতায় বাঁ দিকটা ঢাকা পড়ে গেলেও কাপড়টা দোলে ওদিকে একটা সাইড-ব্যাগে কিছু খাতা, দু একটা প্রয়োজনীয় বইপত্তর থাকে মাঝে মাঝে সময় কাটানোর জন্যে।

প্রাইভেট টিউটর হিসেবে সমীরণের এখন একটু নাম হয়েছে। গৃহ-শিক্ষক কথাটা এখন উঠে গেছে। অবনীরা নতুন বাড়ি করার পর যাদবপুরের ওদের আগেকার ঘর দুটো সমীরণরা পেয়ে গেছে। আজকাল চারদিকে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল যেভাবে গজিয়ে উঠেছে কিন্তু সেরকম চোস্ত মাস্টার পাওয়া মুস্কিল তাই সমীরণও ওদের পড়াবার মতো নিজেও পড়ে নিয়েছে ঠিক স্কুলের ছাত্রের মতো। আর এসব স্কুলের ছাত্রদের পড়িয়েও লাভ। আরো করতে পারলে আরো। টাকাটা আসে অনেক বেশী। সমীরণের এখন মাসে প্রায় আট নশোর মতো আয়। বিদ্যেটা বেশ ভালেভোবেই বিক্রী হচ্ছে। এখন বিপ্লবটিপ্লব কথা টথাগুলো শুনলে গায়ে যেন কেউ জল-বিচুটি ঘষে দিয়ে যায়।—কি বিপ্লব ? তুমি বেঁচে আছো তো ? তোমার হাঁপানির টানটা এখনো আছে ? নাঃ, মাঝে মাঝে পাগল-পাগল লাগে। অন্ততঃ একটা ঝড় বয়ে যাক্, একটা বিরাট সাইক্লোন আসুক। তখন নিজের বাঁচা নয়, মানুষেরা বাঁচতে শিখছে এটা যেন অন্ততঃ ও দেখে যেতে পারে।

—বাঁচা ? কথাটা নিজের কানেই একটা খিস্তির মতো শোনালো। এখনওতো ওর খিদে পায়। ইচ্ছে করে ভাতের পাশে একটু আঁশের গন্ধ থাক্, মায়ের জন্যে একটু সরু চাল, এক বাটি দুধ। ঘর থেকে বেরুবার সময় কিংবা ঢোকবার পথে দূরের মল্লিকাদের জানলায় চোখটা টেনে নিয়ে যায় না ? যায়না এমন ডাহা মিথ্যে কথা ও বলতে পারবে না। দিদির সঙ্গে দেখা করতে আসার অছিলায় বাড়িতে মল্লিকা এলে সমীরণের কথা বলতে ভাল্লাগে না ? ভালো লাগে।

সমীরণেরা এখনো দু'বেলা খেতে পায়। ভারতবর্ষের ষাট কোটি মানুষের মধ্যে কতভাগ তা পায় ? এটুকু ভাবলে সমীরণের দুঃখটা একটু কমে। ব্রেড, এগ এণ্ড বাটার নয়। দুটো ভাত কি রুটি।

দাদার আর একটা প্রমোশন হবার পর বিয়ে হয়েছে। দাদা ঘরের

অসুবিধের কথা জানিয়ে একডালিয়ায় ফ্ল্যাট নিয়েছে। রেজিস্ট্রি ম্যারেজ। তারপর বোধ হয় কোন্ একটা বন্ধু পার্টি দিয়েছিলো। মা যায়নি, বউকে যদি বরণ করে ঘরেই না তুলতে পারলো, তাহলে কিসের বউ? দিদি সারা দুপুর কেঁদেছে, আর সমীরণ বই-এর পৃষ্ঠা উল্টোতে উল্টোতে ভাবছিলো—এরা কি বোকা! দাদা বৌদির মাঝে মাঝে দয়া হয়, আমরা কেমন আছি দেখতে আসে? দিদির এখন বোধ হয় চেষ্টা করলেও বিয়ে হবে না। দিদি তবু এখনো সাজে। সমীরণেরও একটা চিরুনী আছে।

সমীরণ এখন আর ভবিষ্যতের কথা ভাবেনা। যেমন চলছে, তেমনি চলুক। আপাততঃ একটা সরেস টিউশ্যনি পাওয়া যাবে। রাস্তাটার হদিশ পাওয়াটা তাড়াতাড়ি দরকার। আজ ছুটির দিন। সকালের দিকে দেখা করতে বলেছেন। বড়লোকের সকাল মানে ন'টার আগে নয়, শ্রাবন মাস শেষ হতে চললো মেঘ, হঠাৎ বৃষ্টি, আবার কখনো নীলচে আকাশ! এখন রোদের আঁচ বাড়ছে, ভ্যাপসা গরমে পাঞ্জাবীর গলাটা ভিজে যাচ্ছে। আর একটু এগুলে গোলপার্ক, তারপর হিন্দুস্থান রোড, রাস্তাটা চেনা আছে, তবে এসব দিকে এসে বাড়ি খোঁজাটাই হোল একটা ঝামেলা। একটা ঠিকানার সঙ্গে পাশের ঠিকানার কোনো মিল নেই। অমুক নম্বর বাই অমুক, বাই···

সমীরণ হাঁটছে।

হাঁটছে আকাশ। সঙ্গে সঙ্গে রোদের ডানায় পেঁজা তুলোর মতো মেঘ পাখি হ'য়ে উড়ছে। দুটো—আঙ্গুলের চাপে সিগ্রেটটা প্রায় ভেঙে যাবার উপক্রম হোলো। হঠাৎ যেন সমীরণের হালকা চটিটা মিলিটারী গামবুট ব'লে মনে হোলো। কাঁধটাকে ঠিক এই মুহূর্তে খুব একটা হালকা মনে হচ্ছে না। আকাশের কোন্ দিকটাকে ঈশান কোন বলে? ওখানে কি কখনো কালো মেঘ জমবে না? সমীরণের স্বপ্নের সাইক্লোন? যা হঠাৎ সব কিছু ভেঙে চুরে দিয়ে দুনিয়াভর একটা সবুজ মাঠ করে দেবে? আর সেখানে বিস্তীর্ণ সবুজ হঠাৎ গজিয়ে ওঠা ঘাস-ফুলের মতো একটা লাল স্বপ্ন?

সমীরণ ঠিক জায়গাতেই ঢুকেছে। এখানেই ওর ঠিকানা।

ডান পকেট থেকে বিশ্বজিৎদার দেয়া ভাঁজ করা চিরকুটটা আর একবার দেখে নিল। না, ঠিক আছে।

'কুকুর হইতে সাবধান'

সাইনবোর্ডগুলো প্রায় বাড়িতেই ঝোলানো রয়েছে। এই বাড়িটার গেটেও ইংরেজীতে একই লেখা—

বিশ্বজিৎদার মুখে কুকুর আর কুকুরের খাবার আর তার শরীরের জন্যে আলাদা সাবান, ব্রাশ, পাউডার থেকে তার যা যা চার্ট শুনেছে তাতে সমীরণদের আর্ধেক মাস চলে যায়। মাঝে মাঝে বাড়ির মালিক আদর করে একটু সত্যিকারের স্কচ খাওয়ায়······কথাটা বলার পর বিশ্বজিৎদা যেন খুব একটা মজার কথা বলেছে এই ভেবে হ্যাঃ হ্যাঃ করে অনেকক্ষণ ধরে হেসেছিলো।

কথাটা শুনে সমীরনের মনে হয়েছিল—কুকুর কিংবা ওদের যে কাউকে গুলি করে মারা উচিত ছিলো।

যে দেশে ষাট কোটি······

হল্লাগুল্লা পিকনিকের পাশে খাওয়া শেষ হবার আগেই গ্রামের ল্যাংটো ছেলেগুলো জুলজুল চোখ নিয়ে কুকুরের মতো সার দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। যে দেশে কয়েক টাকায় যৌবন ফেরিআলার মতো বিক্রি হয়ে যায়। যে দেশে ষাট কোটির মধ্যে টিপ সই······।

আকাশবানী ক'লকাতা, এখন খবর পড়ছেন···

দুশ্ শালা কি সব উল্টোপাল্টা ভাবছে সমীরণ!

—কি ভাবছো গুরু! দারুন মাইনে দেবে হে! সাইনবোর্ডটার গায়ে একটু হাত বুলিয়ে খট খট করে লনের পাশে লোহার তালাটা বাজাতে থাকে। দারোয়ান······।

আসছে মাসে মায়ের জন্যে একটু সরু চাল······

—ভোলে বাবা পার করে গা

অন্ততঃ একটু চুনো মাছ……

—বোম বোম তারক বোম

চিনির যা দাম……

—ভোলে বাবা পার করে গা

একটা ব্রা-এ দিদির চলে না…

—ভোলে বাবা পার করে গা।

শ্রাবণ মাসের শেষ। ভক্তের সংখ্যা দিনে দিনে বাড়ছে। সিনেমাটা আরো বাড়িয়ে। দিয়েছে মনে পড়ে—সমীরন একদিন একটা পড়ে থাকা ঠাকুরের মুখ গোড়ালীর ঘায়ে থেঁতলে দিয়েছিলো।

তখন সমীরণদের প্রত্যেকের হাতে একটা ক'রে রিভলবার।

প্রীতিশদার বাড়িতে এখন পার্টি হয়। নতুন গাড়ি কিনেছে। একদিন পার্ক স্ট্রিটে লাঞ্চ খাওয়াতে চেয়েছিলো।

আমাদের রিভলবার ছিলো।

তপন এখন বিলেতে। ওর বাবা নামকরা ব্যারিষ্টার। পশারটা উনি ছেলেকেই দিয়ে যাবেন।

আমাদের প্রত্যেকের আলাদা রিভলবার ছিলো।

মল্লিকা'র বিয়ে হবে। রবসনের গান ছাড়া কি সমীরণ দু একটা রবীন্দ্রনাথ শিখতে পারতো না?

আমেন।

আমেন॥

পাগলী মেয়েটার যেন কোন জ্রক্ষেপ নেই

জননী

ঠিক সময়ে ট্যাকসি পাওয়া এবং এই জ্যাম পেরিয়ে ট্রেন ধরা একটা ব্যাপার। রাবিশ। সারা পৃথিবীর উপর বিরক্তি নিয়ে ভদ্রলোক এক সময় ঘাড়ে গলায় মুখে ঝামা ঘষার মতো রুমাল বোলালেন। এই ফাল্গুনের গরমেই ভদ্রলোক ঘেমে নেয়ে অতি কষ্টে এই কামরায় সস্ত্রীক সেঁধিয়ে যেন আমাদেরই অপরাধী করে তুললেন। এই সময় বসন্ত উৎসবের ভিড়। জায়গা পাওয়া যায়? কিন্তু দেখেছি পৃথিবীতে এক ধরনের মানুষ আছেন, যাঁরা ঠিক সময়ে ঠিক মতোনই এসে যান, জায়গাও পেয়ে যান, আবার সমস্ত পৃথিবীকে অবজ্ঞাও করেন। ভদ্রলোককে দেখে সে রকম একজনই মনে হল।

নিখুঁত পোশাকের এই জুটি সম্বন্ধে অনেকেই শশব্যস্ত হল। মিথ্যে বলবো না আমিও যে একেবারে নিশ্চুপ ছিলুম, তাও নয়, বিশেষ করে ভদ্রমহিলার বুকে লেপ্টে থাকা ফুটফুটে এই এইটুকু একটা ছেলের জন্যে। কতই বা বয়স হবে, জিজ্ঞেস করতে সাহস হল না। তবে মাসদুয়েকের বেশী তো নয়ই? নিশ্চয়ই না। এই এতটুকু একটা বাচ্চা নিয়ে কেউ বেরোয়? কি জানি, হয়তো এমন কিছু জরুরী কাজ আছে। কামরার এই গরমে ভদ্রমহিলা এবং বাচ্চাটির চোখ-মুখ লাল।

ট্রেন চলেছে শান্তিনিকেতনে।

বেশীর ভাগ যাত্রীই বসন্তউৎসবের। আমিও। কলকাতার হাজার কাজকর্মের ঝামেলা মিটিয়ে সবসময় চলে আসা সম্ভব হ'য়ে ওঠে না। তাই এভাবেই কোনো না কোনো কাজের অছিলায় প্রায় পালিয়ে আসতে হয়। এ যেন এক দলছুট খেলা। ভালোই লাগে মাঝে মাঝে এই উড়োনচণ্ডী খেলার। নিজেকে যেন ইচ্ছে করেই

হারিয়ে দেওয়া। এবার একটু নিশ্চিন্ত হ'য়ে-যাচ্ছি। মনটাও হালকা পালকের মতো আকাশ বাতাস সব কিছু মিলিয়েই এমন কি এই ভর দুপুরের ট্রেনের কামরাটাকেও মনে হয় ছুটি ছুটি।

সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য জানিনে ভদ্রলোক কথা বলার জন্যে আমাকেই নির্বাচিত করলেন, তার মানে ট্রেনে আমি হলুম একজন ঈর্ষণীয়-পুরুষ। আমার বদলে এই ভাগ্য আর কাউকে দিতে পারলে আমি পরমনিশ্চিন্তি বোধ করতুম, কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমি উপায়হীন। ক্রমাগত ভদ্রলোকের আলাপের ঠ্যালায় আমি সত্যিই নাজেহাল। সঙ্গের ভদ্রমহিলা শহরে থাকলেও ঠিক পুরোপুরি ক'লকাতা মনে হচ্ছিলো না। কারণ বিশ্রী হাত-কাটা লোকটা ব্লাউজের সঙ্গে শাড়ির গরমিল, হাতে বেশ গয়নাগাটি শাঁখার মধ্যে বেশ ঝকঝকে একটা ঘড়ি উঁকি মারছে। উনি একটু পেছিয়ে আছেন। তবে ইনি স্বামীগর্বে বেশ গর্বিতা। এবং এই ভদ্রলোকও গর্ব করার মতো নিজের সম্পর্কে বেশ বড়ো বড়ো কথা শুনিয়ে যাচ্ছিলেন। ভদ্রমহিলা যে সুন্দরী, একথা অস্বীকার করার উপায় নেই, বারে-বারে চোখ চলে যাচ্ছিলো বলে, আকাশের দিকে তাকাতে বাধ্য হচ্ছিলাম। পরিষ্কার ঝকঝকে রোদের নীলআকাশ। ভদ্রমহিলা আরো সুন্দরী করেছে ওর কোলে লেপ্টে থাকা ফুটফুটে একটি শিশু। টুকটুকে লাল জামা গায়ে। স্তনের বোঁটায় ওপরে রাখা আলতো ক'রে ছোঁয়ানো আঙুল। কপালে ছোট্ট একটি টিপ—কাজলের। ভদ্রলোক ওর গায়ে বেশ ঠেসেঠুসেই বসে আছেন। হাতের ব্যাগের মধ্যে দুধভর্তি ফিডিং বোতল উঁকি মারছে।

এর মধ্যে ফেরিঅলা পেন থেকে শুরু ক'রে লজেন্স পর্যন্ত এক অসম বিক্রির প্রতিযোগিতা। আলো, ভ্যাপসা অন্ধকার, গরম ঘাম না বোঝা চীৎকার তার মধ্যে মাঝে মাঝে রোদের গন্ধ নিয়ে বাতাস। শিশুটি ইতিমধ্যেই ভিজে প্রায় জবজবে হ'য়ে এসেছে, তার একথা বোঝার কথাও নয়! মাঝে মাঝে শরীর তার চমকে উঠছে।

এতক্ষণে ভদ্রমহিলাও ক্লান্ত। চোখেও রাতজাগার ছাপ। ভদ্রলোকের আপাতত কিছু করার নেই। শুধু পৌঁছোনোর সময়

জিজ্ঞেস করা ছাড়া। এর মধ্যে একবার ভাবলুম সিগ্রেট ধরাই। ইচ্ছে হোলোনা।

ঢাঁই করা মাছের গাদার মতো মানুষ নিয়ে ট্রেন চলছে, প্যাসেঞ্জার ট্রেন ষ্টেশন ধরলেই ভিড় বাড়ছে, ক্রমশঃ বাতাস বন্ধ হ'য়ে আসছে।

ভদ্রলোক এবার বিরক্ত হ'লেন খানিকটা চটে যাবার মতো এর বদলে সন্ধ্যের মেলটা ধরলে ভালো হ'ত। ভদ্রলোক ক্রমশঃই চটে উঠছেন। স্ত্রীর সমস্ত ক্লান্তি এখন চোখমুখ গোটা শরীরে ভর করেছে।

ঠিক এই সময়ে পেছনের ভিড় ঠেলে বেরিয়ে এলো পাগলি পাগলি চেহারার এক ভিখিরী। ঢোকার আগেই তার গলা শোনা গেল—ও বাবারা দশটা পয়সা দেবে সারাদিন খাওয়া হয়নি। কথাটা সবাই শুনছে, কিন্তু কেউ গ্রাহ্য করছে না কেউ বা মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে নিচ্ছে, কেউবা মাপ করার ভঙ্গীতে হাত জোর করছে। এবার ঝপাং ক'রে সামনে এসে পাটভাঙা জামাকাপড় চেহারা দেখে ভিখারিণী ভদ্রলোকের প্যাণ্ট জড়িয়ে ধরলো—ও বাবা কিছু দাও বাবা ভগবান মঙ্গল করবেন। ময়লা হাতের ছাপ পড়বিতো পড় কুচকুচে কালোয় দাগ পড়লো। ভদ্রলোক সিধে পা শুদ্ধু ঠেলে দিল। কমজোরী মা, ঠিকমতো সইতে না পেরে আরেকজনের পায়ের কাছে উবু হ'য়ে পড়লো। তারপর ভুল বুঝো পাশের কামরায় মিশে গেল।

ট্রেন চলেছে শান্তিনিকেতনে।

বাইরে ভীষণ গরম। কামরায় ভিড়। ষ্টেশন একের পর এক আসছে। থামছে, চলছে। থামবার কথা নয় এখানে তবু একটা ছোট ষ্টেশনের পাশে বুনো জন্তুর মতো হাঁফাতে হাঁফাতে ট্রেনটা হঠাৎ থেমে গেল। এখানেতো এই ট্রেন থামেনা। কচ্ছপের মতো সার সার মুণ্ডুগুলো জানলা দিয়ে ঢুকছে বেরুচ্ছে। শোনা গেল আগের ইলেকট্রিক ওভারহেড লাইনে চালঅলার একজনের শরীর ঝুলছে।

তাহলে কি হবে, হৈ হৈ কেউ নেমে পড়ছে কেউবা উৎসাহী হয়ে তাকিয়ে দেখছে ?

ভিড় ঠেলাঠেলি আর গুমোটে—কোলের বাচ্চাটা ক্রমশঃই নিস্তেজ হয়ে পড়ছিল, ভদ্রলোক ঘামছিলেন, ঠিক এই সময়েই এলিয়ে পড়লেন সুবেশা ভদ্রমহিলা, হঠাৎ ভদ্রলোকের গায়ের উপর মাথা দিয়ে নিস্তেজ হয়ে এলেন। বাচ্চাটার যেন কোনো সার নেই। সোনা,···সোনামণি, আমার সোনার কি হ'ল। ভদ্রলোক কি করবেন ভেবে পাচ্ছেননা, ততক্ষণে তার প্যাণ্টশার্টের খেয়াল নেই, ফিডিং বোতলশুদ্ধ প্লাষ্টিকের ব্যাগটা কোল থেকে গড়িয়ে গেল। নিস্তেজ হয়ে পড়ছে শিশুটি, কারো কিছু করার নেই।

এই কামরায় গোলমাল, চীৎকার শুনে আবার সে এগিয়ে এসেছে।

কেউ দেখেনি সে ভিখারিণী ভিড় ঠেলে কখন সবার সামনে এসে পড়েছে। কারো চোখ পড়ার আগেই নিজেই বাচ্চাটাকে সবার পায়ের সামনে থেকে হিংস্র দু'হাতে আশপাশ ঠেলে ভদ্রলোকের কোল থেকে সোনাকে দুহাতে ছিনিয়ে বুকের ওপর রেখে কাপড় উদোম করে সবার সামনেই স্তনের বোঁটাটা গুঁজে দিল শিশুর মুখে। সোনা একটু চমকে উঠে পরম তৃপ্তিতে মায়ের বুকে মুখ রাখলো। গভীর স্নেহে মাথায় বুকে তালুতে হাত বুললো মা।

আর ভিড়েরই গা ঘেঁষে পরমপ্রার্থী হয়ে আরেক ভিক্ষুকের মতো তাকিয়ে রইলেন আপাদমস্তক একজন ভদ্রলোক।

পাগল মেয়েটির কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই, সে তখনো পাগলের মতো শিশুকে বুকে জড়িয়ে বলেই চলেছে—সোনা, আমার সোনামণি।

ওস্তাদ

দর্শনা ষ্টেশনটা বন্ধ করে দেওয়া সত্ত্বেও বগীভর্তি ছাগলের মতো মানুষ-গুলোর পথ গেল পাল্টে। হু হু করে পেট্রপে'ল পেরিয়ে বনগাঁ, তারপর সেই লাইন ধরে বরাবর শিয়ালদা সেখান থেকে যাদবপুর, ছিটে-বেড়া মাটি থেকে মুলিবাঁস এর আস্তানায় কিছু কিছু ইট পড়তে লাগল। দেশের স্বপ্ন মুছে যায়নি বোঝা যায়, আরো কিছু জমি আঁকড়ে একটু ঝিঙে, কুমড়া, লাউ লঙ্কা লতিয়ে দেওয়া। শেয়ালদা থেকে যাদবপুর থেকে এখন প্রায় সীমান্তে গিয়ে পৌঁছেছিল ছিন্নমূল মানুষ। জীবনভোর সংগ্রাম। বাঁচার সংগ্রাম, টিকে থাকার সংগ্রাম অস্তিত্ব সম্মান বজায় রাখার লড়াই। জবরদখল জমিগুলো হ'য়ে উঠলো বিখ্যাত দেশ-গৌরবের নামে। জবরদখল কলোনী এখন নিবাস বা নগর নামকরণে তকতকে বাড়ি আলোয় নতুন রূপ পেয়েছে। এখন আর অমুককে কেউ জবরদখল কলোনীর মানুষ বলে না, বলে ক'লকাতা সাত লক্ষ অ্যাত্তো।

ক'লকাতার এদিকে যখন দারুন যজ্ঞ শুরু হয়েছে। সরকারী ডোল থেকে সুরু ক'রে সরকারের কাছে নানাভাবে আদায় ক'রে নেওয়া হচ্ছে। তখন শহরের আরেক প্রান্তে যোগাযোগের সেতু ছিল লম্বা লোহার এই সেতুটা। খালটা পার হবার জন্যে অতদূর আর কেউ কষ্ট করতো না, গ্রামের জমিজিরেত যাদের আছে চাষী বাসী বা ক'লকাতায় যাদের যেতেই হয়, তার খালটার পার হওয়ার জন্যে বেছে নিয়েছিল নৌকো। জলভর্তি থাকলে মাঝিকেই পার করে দিতে হ'ত, তানা হলে ছুটো নৌকো জোড়া দিয়েই কাজ চলে যেতো।

কলকাতার উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম ক্রমশঃই ঘিঞ্জি হ'য়ে উঠছে।

এরোপ্লেন থেকে নেমে বড়সড় মন্ত্রী, ভি আই পি দের আসা দুস্কর হ'য়ে উঠলো। তাই সরকার ঠিক করেছে এখান থেকেই বেরুবে একশো ফুট চওড়া রাস্তা। আর ওদিকে ভেরী বোঝার পর তৈরী হবে, নতুন উপনগরী—সল্ট লেক। মানে লবণ হ্রদ—একর একর ভেড়ি বুজিয়ে কলকাতার ভিড় কমাতে। এদিকে গ্রামের রেললাইনের পাশে আর্ণল্ডি জুট মিলে আলোচনা হয়—মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে মাইরী মুখ্যমন্ত্রীর। ডাক্তারী করছিলিস বেশ হচ্ছিলো, মুখ্যমন্ত্রী হয়ে এই সব পাগলামী মানায়? মাইলের পর মাইল ভেরী বুঝে যাবে। কলকাতা থেকে সারা দুনিয়ার মাছ এখান থেকে চালান যায়। কোন ঝাঁপিতে পোনা কাতলা, কোনটায় পারসে বাটা ভাঙন মায় চিংড়ি। —মাছটা কি গাছে ফলবে? মিলের ভোঁ পড়ে। রাতের ভাটিখানা জমে ওঠে।

এক নম্বর বোতলের পেছনে থাপ্পড় মেরে বেতেরছিপি খুলে ছাকনি দিয়ে মাল ঢেলে যে যার জায়গায় গোল হয়ে বসে যায়। তারপর একসময় বাড়ি ফেরে।

গ্রামের লম্ফগুলো জলে, হ্যারিকেনের পলতে কমিয়ে দেওয়া হয়। চাপা অন্ধকারে ঘরের মানুষটার জন্যে অপেক্ষা ক'রে থাকে বৌ ঝিরা।

কলকাতার সকাল হয় অনেক পরে। কলকাতা তখনো জাগে না। জাগার কথাও নয়, এটা হল পুকুর গাছগাছালির গণ্ড গ্রাম। কৃষ্ণপুর থেকে এয়ারপোর্ট তারপর আর ঘন গাছগাছালির মাঝখান দিয়ে পথ গেছে বাগুইহাটি দমদম থেকে আরো কতদূর। ওদের কলকাতার রোজকার খোঁজখবর রাখার দরকার হয় না। প্রয়োজনও নেই। তাই সকাল এখানে আসে ভেরীর দূর প্রান্ত থেকে। বালি বোঝাই শুরু হয়েছে। লরির পর লরি এসে এদিককার ভেরী প্রায় সাফ করে দিয়েছে। ওখান থেকে এখনো আকাশ লাল ক'রে সূর্য ওঠে।

তখনও কলকাতা জাগে না।

যখন দূরের মাঠ আর আবছা ভেরীর জল থেকে সূর্য লাফিয়ে একসময় রোদ হ'য়ে ওঠে। কলকাতার তখন আড়মোড়া ভাঙে। ঠিক সেই সময়ে দূরের ভেরী থেকে ভোরের আবছা আলোয় ডানা মুড়ে এক ঝাঁক কাদাখোচা পাখি উড়তে উড়তে ডানার বালি ঝেড়ে আশপাশ গ্রামের মানুষদের ঘড়ির অ্যালার্ম হয়ে প্রায় ঠিক একই সময়ে উড়ে যায়।

এক সময় এটাই ছিল বাবুদের পিকনিকের জায়গা। সব বাবুদের নয়, একটু বড়লোক বাবুদের। গাড়ি ক'রে ভ্যান ক'রে দল বেঁধে আসতো। হাতে থাকতো ছড়ড়াগুলির বন্দুক। অনেক কাদাখোচা বালিহাঁস মুখ থুবড়ে পড়তো জলে, ভেরীর নৌকো বা বুক জল রাতভোর থাকার মানুষ নিয়ে এসে দিতো সাহেবদের হাতে। লাইন ধরে দরমার ঘর। আর মাঝে মাঝে নানা মালিকের ভেরীর বিশাল দাঁড়িপাল্লা। মাছ ওজন হ'লে লরি টেম্পো ভেণ্ডার ঝুড়ি পেটে গাদা হ'ত। মানিকতলা থেকে, হাতিবাগানের মাছের বাজার কি আর এমনি এমনি নাম করেছে?

ক'লকাতা জাগবার আগে, আরো অনেক আগে আরেককার জেগে ওঠে পলাশপুর গ্রাম। নৌকো খড় নিয়ে যায়, ভাসে হাড়ি কলসী, মাছ নিয়ে যায় আধো অন্ধকারে। এ খাল আগে মিশেছিলো সেই পুব বাংলার সীমান্তে। সবই যায় কিন্তু নৌকোর তলায় থাকে ব্লাডার। মানিকতলা হয়ে সরাসরি কলকাতায় আসে। বাকীটা যায় আর একটু দূরে। পূর্ববাংলায় কলকাতার ব্লাডার দ্বিগুণ দামে যায়। শেষ রাতে বাড়ি বাড়ি থেকে কুটির-শিল্পগুলো ব্লাডারে পুরে নৌকোর খোলের তলায় চেপে শহরের দিকে ভাসিয়ে দেয়—জগত শেখ, বিষ্ণু সরকার, কেষ্টো হালদারের লোকেরা। ইয়া ইয়া পলিথিনের জারে করে একদঙ্গল জাগ নামিয়ে রাখে পুকুরের এপাশে পোড়ো দোতলা বাড়ির ভেতরে টানা লম্বা বারান্দায়। এই সব খারাপ গপ্পো কলকাতার ব্যস্ত মানুষদের জানার কথা নয়।

শহরের রাস্তা ব্যস্ত হয় সেই সময়। এই সময়ে এখানকার একমাত্র

জুট মিলের চোঙা ভোঁ বাজিয়ে জানান দেয় কাজের ভোর হ'ল। শিফটিং ডিউটি। আর ঠিক তখনই শাঁখের মতো আওয়াজ বাজিয়ে চলে যায় ট্রেন, অথচ এখান থেকে তার শব্দ শোনা যায় না। শাঁখের শব্দ বাজানো এই ট্রেন ক'দিন হল চলতে শুরু করে দিয়েছে। যেদিন প্রথম ছাড়া হ'ল তখন গ্রাম ঝেঁটিয়ে লোকগুলো গিয়েছিল দেখতে, এমন কি ভেরীর মানুষেরা পর্যন্ত। কি ঝকঝকে চকমিলানো ট্রেন, ইলেকটিরিতে চলে। মাঠ থেকে দাঁড়ালে মনে হয় দূরে কেন্নোর মতো এঁকেবেঁকে চলে গেল। প্রথম দিকে বেশ কয়েকদিনতো মজার মনে হ'য়েছিলো।

একদিকে শহরের সীমান্ত। আরেক দিকে পলাশপুর কৃষ্ণপুর থেকে বাঙ্গুর বাগুইআটি ছাড়িয়ে শহর সীমান্ত। তাকে জোড়া দিয়ে রেখেছে প্রায় দোতলা সমেত লোহার ব্রিজ। একে ব্রিজ বলল ব্রিজ, সাঁকো বললে সাঁকো। এই সব নড়বড়ে সব কিছু উপড়ে দিয়ে এখান থেকেই উঠবে নতুন ব্রিজ, এ প্রান্ত থেকেই পাঁচ মাইল, মানে ঠিকেদারদের ভাষায় যাকে বলা যায়—জিরো পয়েন্ট। বিরাট বক্স-কাল ভার্টের উপর দিয়ে মোলায়েম করে তৈরী হবে রাস্তা। চওড়া একশো ফুট। গ্রামের মাঝখান দিয়ে দেহাতী মেয়ের মতো রাস্তাটা গিয়ে মিশবে বিমানবন্দরে। যতটা সাজানো যায়, বুড়ি ক'লকাতাকে নতুন ক'রে সাজানো হবে। সরকার বিরোধীপক্ষ সবাই এক কথায় রাজী। দিল্লীও সবুজ-সংকেত দিয়ে দিয়েছে। কলকাতায় আসতে যেতে জব চার্নকের শহরের ধকল অনেকদিন সওয়া গেছে, আর নয়। এর জন্যে নতুন করে নতুন সরকারী সংস্থা তৈরী হয়েছে। কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, যতটা পারো ভালো কর। ছবির মত কাগজে আঁকা হয়েছে রাস্তা। দু'দিকে চল্লিশ ফুট রাস্তা, মাঝখানে কুড়ি ফুট বাগানে থাকবে রকমারী ফুলের গাছ। কাউকে বুঝতেই দেওয়া হবে না আসল কলকাতার খবর। বিদেশীলোকরা দেখে বলবে কলকাতা সত্যিই তিলোত্তমা হয়েছে। ওপাশে মাটি বালি বোঝাই হয়ে যাচ্ছে। দূর থেকে দেখলে মনে হবে খানিকটা মরুভূমির চেহারা নিয়েছে।

গ্রামের উদয়াস্ত খেটে খাওয়া মানুষ এখনো পর্যন্ত কিছুই জানে না। জানার কথাও নয়, এ সব দরকারী কাগজপত্তরের কথা, সরকারের লোকজন আমলারাই জানে। পলাশপুরের মানুষদের জানার কথা নয়।

নিস্তরঙ্গ গ্রামের দুপুর। কচুরিপানা সরিয়ে ঘাটে জলঠেলা পুকুর, ওপারের খালে ধান বোঝাই নৌকো, এপারের খালে ধোপার কাপড়ের ভাটির বাণ্ডিল। এখনো ভেরীর মাছ, হাল দেওয়া চাষীর কিংবা চাকা ঘোরানো কুমোরের জানার কথা নয়, যাকে সরকারী এক্সপ্রেসওয়ে বলে, তা রাস্তা যাবে এই গ্রামের বুকের ওপর দিয়ে। জেনে গেছে সরকারী কেরানীদের ঠিকেদারের কাছে টাকা গছিয়ে টাউট দালালরা, তারা জমি-জমার খোঁজ রাখছে। মাষ্টার প্ল্যান তৈরী হলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে। তক্কে তক্কে আছে।

অনেক দিন আগে আগেকার ক্যামেরা ষ্টাণ্ডের মত তিন-পায়ার ওপরে ছোট্ট দেখার যন্ত্রে, লোহার চেনটেন দিয়ে কি যেন সব মাপ জোক হয়ে গিয়েছিল, স্ট্যাণ্ডে দাঁড়ানো একটা বোর্ডে কি সব আঁকা-জোখাও হয়েছিল, সে সব কথা এখন আর কারো মনে নেই। গ্রামের একধারে একটা বিশাল পোড়ো বাড়িটার এক দালানে সীমেণ্টের পলেস্তরা দিয়ে একপোচ রঙ মাখিয়ে বেশ জম্পেশ করে কালো হলদে বোর্ড টাঙিয়ে দেওয়া হল—একেবারে গেটের ধারে দেওয়ালে। চেয়ার টেবিল আর জুটমিলের ধার থেকে ওভারহেড ইলেকট্রিক লাইন বালব ঝোলানো চেয়ারটেবল নিয়ে ঘুর পথে ট্রাক আর লোকজন আসতে, নানা জিনিষপত্র, নামাতে দেখে কালো কালো আদুল গায়ের ছেলেরা সামনে ভিড় ক'রে দাঁড়াল, দুচারজন মেয়ে বউ কাজের ফাঁকে উকি-ঝুঁকি মেরে গেল, লুঙ্গীর ওপর পাজামা চাপিয়ে দাঁতে বিড়ি চেপে, আবগারী ধরনের সাইনবোর্ডটার ওপরে আলতো হাত বুলতে গিয়ে লুঙ্গীর ওপর গোঁজা চকচকে রামপুরী চাকুর উপর জগ্‌গু শেখের একবার হাত চলে গেল। বিড়িটায় একদমে বেশ খানিকটা ধোঁয়া নিয়ে মুখ দিয়ে আওয়াজ এলো—শাহ্‌ল্লা।

দেখেছে চাঁপাও।

বারবার ঘুরে ফিরে ফনিমনসার বেঁড়ার পাশে এসে একটু আড়াল ক'রে, উঁকি মেরে বাড়িটার দিকে তাকায়, কবে থেকে এই বাড়িটা পোড়ো হয়েছিল, যারা বানিয়েছিল তাদেরও চাঁপা দেখেনি, কেন যে এখানে এত্ত বড় একটা বাড়ি তৈরী হয়েছিল তাও সে জানে না, যারা ছিলেন, তারা আজ নেই, কলকাতায় বাসা বেঁধেছে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত হঠাৎ হৈ হৈ করে গাড়িটাড়ি ক'রে এসে পিকনিক ক'রে যেতো। এখন আর আসে না। এখন সত্যিই বাড়িটাকে ভালো লাগছে চাঁপার। কাজের ফাঁকে, নারকেল গাছের সিঁড়ি দেওয়া পুকুরের ধারে বাসন ধুতে ধুতে, কিংবা অবসর বিকেলে বাড়িটাকে দেখতে ওর ভালো লাগে। খুব মজা হবে, কারণ গরমেণ্টের আপিস যখন, তখন অনেক গাড়ি আসবে, লোকজন গমগম করবে দোকানপাট বসবে নিয্যস। গ্রামটা যেন শশ্মান হ'য়ে গিয়েছিল, এখন দুপায়ের মলের মত ঝমঝম করে উঠবে। পলাশপুর ঠিক পলাশপুরের মতো হবে। নতুন একটা দেখবার জিনিষ হল বটে। এখানে বন্ধু বলতে চাঁপার আর কে আছে? শচী, কালী মালতিরা কবে চলে গেছে বিয়ে ক'রে। শেষ কনে সাজিয়ে ছিল চাঁপা—কালীকে। তখন চোখের জল আর বাঁধ মানেনি। আগে আগে ওরা আসতো, এখন বোধ হয় গিন্নীবান্নী হয়ে গেছে। এখন যারা আছে তাদের সঙ্গে চাঁপার আর তেমন ভাবসাব নেই। বয়সে ছোট, মেলে না। দেখা হ'লে দু'চারটে কথা হয়। ব্যাস্ ঐ অবধি। শেষ একজন ছিল বিজলী। গত বছর কলকাতার টালিগঞ্জে বাড়ি ভাড়া করে চলে গেছে। ওর বাবা ভালো একটা কাজ পেয়েছে। হেড মিস্ত্রীর। এখানে কলের কুলির চেয়ে অনেক ভালো। চাঁপার খুব ইচ্ছে হয় গোটা কলকাতাকে তারিয়ে তারিয়ে দেখতে। তা আর হোল কই। চাঁপার এখন ভালো লাগে না। একটুও ভালো লাগে না।

তবু এখন কতগুলো ভালো ভালো মুখ দেখা যাবে। ক'লকাতার লোকজনকে দেখা যাবে। বাবার মিলটাকেতো কলকাতায় উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে বসানো যাবেনা, বরঞ্চ কলকাতাটাই এই পলাশপুরে উঠে আসুক। গ্রামটা যেন মুখ থুবড়ে পড়েছিলো। চাঁপার তাই ক'দিনভর

ভালো লাগছে, খুউব ভালো লাগছে। ও যেন একটা নতুন খেলা পেয়েছে। চাঁপা ভাবছে পলাশপুর থেকে কেষ্টোপুরের চেহারাটা বোধ হয় বেবাক পাল্টে যাবে, স্বপ্ন দেখে চাঁপা। স্বপ্ন দেখতে চাঁপার খুব ভালো লাগে।

বোর্ড টাঙানোর কয়েকদিনের মধ্যেই আলমারী টালমারি চেয়ার বেঞ্চি টেবল নিয়ে পুরো অফিসের চেহারা নিল দোতলাটা। একতলায় হবে ষ্টোর। সামনের দালানে থাকবে লোহা-লক্কড় মেশিন। হুশহাস ক'রে পেছনের রাস্তা ধরে হাটের পাশ দিয়ে জিপ চলে আসে। সামনের দিক দিয়ে আসার কোনো উপায় নেই। রাস্তাটা দু'ভাগে ভাগ হয়ে কাজ শুরু হবে—ব্রিজ। এরপর এক থেকে দু মাইল, তিন থেকে পাঁচ মাইল ভাগ। ব্রিজ থেকে বন্দর পাঁচ মাইল। মাঝখানে কৃষ্ণপুর থেকে একটা বাইপাশ যাবে। সেটা পরের কথা এখন ব্রিজ আর সামনের দু'মাইল রাস্তা। এর জন্যে ক'লকাতায় বিশাল বাড়ি। কয়েক কোটি···জনাকয়েক ইঞ্জিনীয়ার। জেনারেল ম্যানেজার। কর্পোরেশনের নতুন নাম হ'ল। টেণ্ডার বেরুচ্ছে। কাজও শুরু হয়েছে। একদিকে চলছে ধার থেকে মাটি কেটে উঁচু করা, গ্রামেরও বেশ কিছু লোক কাজ পেয়েছে, বাকী সব কনট্রাকটারেরই লোক। ঝুড়ি করে কাটা মাটি এনে লাইন বরাবর ফেলে এগিয়ে যাওয়া। সারাদিন লোকলস্কর। বিকেল পড়তেই হালকা। সন্ধ্যে হতেই নিঃঝুম। জায়গাটা সম্পর্কে সবাই জেনে গেছে, বিকেল থাকতেই সরে পড়া ভালো। মাঝে মাঝে লাশ পড়ার ঘটনা এখানে মাঝে মাঝে উত্তেজনা আনে। বাড়িটার চৌহদ্দিতে ডালপালা মেলে এগিয়েছে।

এরপর গোটা অফিস দারোয়ানের এক্তিয়ারে, দারোয়ান বললে ভুল হবে, বলা যায় গার্ড। সে এখানকারই আশপাশের লোক। ডাকাবুকো। তাহলে কি হবে। সন্ধ্যে হলেই চাবিফাবি মেরে সে-ও হাওয়া। চাকরী অবশ্য একটা ধরেকরে পেয়েছে। লোকাল এম এল র রেকমেণ্ডেশন জি. এম. ফেলতে পারেনি। কাজ করলে কি হবে, তারও তো ঘরে বিবি বাল-বাচ্চা আছে।

এখানে থাকে একজন—বচন সিং। বচন সিং আছে বলেই অফিস নিশ্চিন্ত। রোলার ড্রাইভার বচন একাই দু'চারজনকে মোকাবিলা করতে পারে। সরকারী অফিসের পুরনো এক্সকিউটিভ, অ্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনীয়ার বা ওভারশিয়াররা একথা আগেই জানে। পুরনো লোক। দুর্গাপুর এক্সপ্রেস ওয়ের কাজের সময় মেমারীতে একজনকে চাকুতে এ ফোঁড় ও ফোঁড় করে দিয়েছিলো। সাক্ষী ছিল না বলেই বেঁচে গেছে, তারপর ওখান থেকে সরিয়ে এখানে। ওর সামনে কোন সাহেবই খুব একটা উল্টোপাল্টা কথা বলে না। বরঞ্চ সমঝে চলে। তবে যে যাই বলুক লোকটা এমনিতে খুব দিলদরিয়া, মুখের বাঁধন নেই, সাহেবদের সম্মান ক'রে কথা বলে, তাই অফিসও ওকে ঘাঁটায় না, উপরি হিসেবে যেটুকু পাওনা তা হ'ল নিশ্চিন্তি। বচনের অ্যাসিস্টেন্ট—বংশী। ওরা একতলার কোণে একটা ঘর বেশ সাফসুতরো ক'রে গুছিয়ে নিয়েছে। শহর গড়ে উঠবে। ভেরী ক্রমশঃই দূরে সরেযাচ্ছে। আর এদিকের খালের আশেপাশে অন্ধকার বাদুড়ের ডানায় ভর করে নিঃশব্দে নামে। এখানে তাড়াতাড়ি গাছের ফোকরে ডালে, পাখীদের ঘুমোবার জন্যে অখণ্ড নিস্তব্ধতা ছড়ানোছিটনো আশ শাওড়া, ভেরেণ্ডা বনতুলসী, বনফুল ফণিফনসার ফাঁকে হ্যারিকেন লম্ফর চোখগুলো জ্বলে ওঠে। মনে হয় গ্রাম টিমটিম ছানিপড়া চোখ নিয়ে এখনো পাহারায় আছে। বড় গরীব হাড় জিরজিরে দুর্বল না খেতে পাওয়া এই সাবেক চেহারা।

আর তখনই আলোআঁধারিতে টুকটাক ঠুংঠাং পোড়োবাড়িটার বাইরের ঢালাও বারান্দার এককোনে অশরীরী আত্মার মতো মানুষ আসে যায়, গ্রামের টিমটিমে চোখে এদের স্পষ্ট করে দেখা যায় না, ন্যাকড়ার মুখবাঁধা প্লাস্টিকের জার থেকে চায়ের দোকানের ছোট গেলাসের মাপে ভরে দেওয়া হয় টাটকা চোলাই। নুন শাল-পাতায় থাকে, মাঝে মধ্যে একটু আচার। একঢোকে দুতিন গেলাস মেরে নুন জিভে ঠেকিয়ে একটা সিগ্রেট, নিদেনপক্ষে বিড়ির আগুন জ্বলে ওঠে। যাদের হাতে তেলেভাজা থাকে, তারা একটু মান্যিগন্যি। দু একটা চৌকিমাপের টুল তাদের জন্যে বরাদ্দ। তারা দু'চারটে

কথা বলার অধিকার পায়। জগ্‌গু, বিষ্ণু মণ্ডলের লোকেরা চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে। তারা খেয়েই থাকে। পরে আরো মৌজ করে খাওয়ার ব্যাপারটা পরে থাকে। ভোর রাতের চালানীটা দেখতে হয়। এরা সবাই দুপুরে ঘুমিয়ে নেয়। জম্পেস ভাত-ঘুম।

বড়্ খতরনক জায়গা এই পলাশপুর। চোলাইয়ের সবচে বড় ঠেক্। সবাই জানে, খদ্দের আবার সবাই ঘুরে ফিরে আসে, কারণ জম্ভুর মালটা এক নম্বর। ইদানীং আবার উঠতি-মস্তানরা আসতে শুরু করেছে। কাজ তো একদিনের নয়। চলবে বহু দিন। বচনদের দুটো খাটিয়া দেয়ালে দাঁড় করানো থাকে। রাতে খাবারদাবার আগে পেতে নেয়। দক্ষিণে দিকে পেল্লাই দুটো জানলা দিয়ে হু হু করে বাতাস আসে।

*　　　*　　　*　　　*

বচন, স্টিয়ারীংটা ছেড়ে রোলার থেকে এক লাফ মেরে হাঁকলো— বংশীঈ। হেল্পার কাম্ অ্যাসিটেণ্ট রোলার ড্রাইভার বংশী। ওস্তাদ গাড়ি ছেড়ে দেবার পর রোলারে একটা কারিগুরি করবেই, তেল ফেল লাগে, জুট দিয়ে মোছে, পার্টস নাড়াচাড়া করে। সাফ করে, মোবিল ঢালে! ডিজেল লাগবে কি না দেখে নেয়। তারপর একসময় রোলারের গায়ে হাত বুলুতে বুলুতে ভাবে— ওকে একদিন খুব বড় একজন রোলার ড্রাইভার হ'তে হবে, ঠিক ওস্তাদের মতো। হ্যাঁ ঠিক ওস্তাদেরই মতো। ডাকশুনে রোলার ছেড়ে দ্রুত এসে বললো—ডাকছো উস্তাদ।

আরে শুন, এস ডি ও সাব আছে?

—সাহেব তো আজ আসেনি ওস্তাদ।

আচ্ছা, তু যা। বংশী গেল না, ওস্তাদকে ও চেনে। যা বললেই যাওয়া নয়, তার পরেরও কথা আছে। বংশী ওস্তাদের কাছে দাঁড়িয়েই রোলারটার দিকে তাকিয়েছিল, আবছা অন্ধকারে ভারবাহী জন্তুর মনে হচ্ছিলো, যেন দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছে। বড্ড ধকল গেছে আজ ওর ওপর দিয়ে।

বচনের হঠাৎ কি মনে পড়ার ভঙ্গীতে বললো—মূলামলজী আছে ? মূলামল হল সিন্ধ্রী কণ্ট্রাকটার, অনেক তদবীর ক'রে এই সোনার-কাজটা পেয়েছে। রোজ পেমেণ্ট করে ওর যেতে একটু দেরী হয়।—ওতো একটু আগে চলে গেল ওস্তাদ। হঠাৎ চকিতে ঘাড় ঘুরিয়ে বচন বললো—চলিয়ে গেছে ? বিড়িটা মুখ থেকে টেনে মাটিতে ছুঁড়ে দিয়ে বললো—শাহ্‌লা হারামী। এই বিল্লিটাকে একদিন কাবাব বনাবো; একদিনেই গায়েব। শাল্লা একদম বিল্লিকা মাফিক।

চল্, বলে বংশীর পিঠে একটা থাবড়া মারলো ওস্তাদ।

বাড়িটার দালানটা চওড়া। সবচেয়ে অদ্ভুত সবকটা ঘরেই সামনে পেছনে দুটো করে পেল্লাই দরজা আছে। সামনের দরজাটা বন্ধ করে দিলে যে কোনো ঘরই আলাদা করে ঢোকা বা বার হওয়া যায়।

ওস্তাদের ঘরটা বংশী নিজের মতো ক'রে সাজিয়ে নিয়েছে। সাজানো মানে দু'জনের দুটো খাটিয়া, দুটো কম্বল, বালিশ, ফিটফাট। একটা জনতা ষ্টোভ, পরিস্কার। এ্যালমুনিয়ামের গেলাস। এছাড়া থালা বাটি, কড়াই। মশলা সব্জির জন্যে আলাদা টুকরি, সব কিছুই ঝকঝকে, তকতকে, গোছানো। ওস্তাদ, বংশীকে বলে—দুনিয়ার তু আর হামি, দোভী একা। আর একটা তাজ্জব বাত্‌ভী আছে, এভি নসীব, দেখ্ তুরভী কুথা জায়গা মিললো না। ছপ্পরমে এতনা কুঠি, এতনা কাম, এত্তো জায়গা, তু হামার সাথ এলি। রামজীর আজব খেল। সীয়ারাম। লেকিন্ তুতো গরমেণ্টের ঘরে আছিস, লেকিন হামার গাঁওকা দেহাত—জরু, খানাভী পাকাচ্ছিস, কামভী করছিস। করি বরগা কাঁপিয়ে হেসে ওঠে বচন। বংশী ওস্তাদের কথায় একটু লজ্জা লজ্জা পায়। অন্ধকার নেমে আসছে।

সামনে নির্জন মাইল মাইল ধূ ধূ বালির প্রান্তর। খালের ওপারে নতুন কাজ শুরু করেছে। দিনে দিনে হ'লটা কি। দেশে এখন দারুন

উন্নতি শুরু হয়েছে। দেশ এগুচ্ছে। আর দিনকে দিন জগ্‌গুর খদ্দের বাড়ছে।

প্রায় পুকুর লাগোয়া বাড়ি। হয়তো পুকুরটার মালিকও ছিল এই বাড়ি। একটা খিড়কী আছে, সেখান থেকে কাঁচা পথ গেছে বাঁধানো পুকুর ঘাট অবধি। ঘাটে কলসী ডোবালে শব্দ আসে। ঝুপঝাপ স্নান করার শব্দ শোনা যায়। তাই প্রায় অন্ধকার থাকতেই ইদানীং মেয়েদের স্নান সেরে বাসন মেজে ঘরে ফিরে যাওয়া। অফিস যখন বসে তখন পুকুরে ছেলে ছোকড়া জনমজুর ছাড়া প্রায় ফাঁকা। খুব দরকার না হ'লে এদিকে কেউ আসেনা। ওপারে একটু এগুলেই মাঠের ধারে একটা চাপা-কল আছে। খাবার জলটা সবাই সময় মতো ওখান থেকে ভ'রে নেয় দু'বেলা, এমন কি বংশী অবধি, তবে বংশীর যেতে যেতে বিকেল গড়িয়ে যায়।

হ্যারিকেনের পলতেটা বাড়িয়ে দিয়ে বংশী বলে কি পাকাবো ওস্তাদ? —সব্জি আছে? আলু ভেণ্ডি পেঁয়াজ যা আছে, তাতে আজ চলে যাবে। আর লেবুর আচারতো আছেই।

ব্যাস্, লাগা সব্জি পরোটা। ওস্তাদেরপরোটা দারুন পছন্দ। আর এই পছন্দটা যখন ওস্তাদের হয়, তখন বংশী আরেকটা জিনিষের আঁচ করে, ব্যাপারটা সেখানে গিয়েই দাঁড়ায় সেখানে ওস্তাদ বলে, একটা বোতলা মাঙা। জগ্‌গুকে হামার কথা বোল্। একটা ব্লাডারে বোতলটা পুরো হয়। সাধারণতঃ ওস্তাদ তিনচার গেলাসের বেশী খায়না। বংশীর ঘরেই বোতল আছে। বংশী মেপে নিয়ে আসে। নগদ পয়সা দিতে হয়না। জগ্‌গু জানে ওস্তাদ গরমেণ্টের লোক। পয়সা মার যাবে না। যায়ওনা। তাছাড়া কম্পানির বাড়িতে ব্যবসা চলবে, আর ভেট দিতে হবে না? তবে পুরো বোতল শুনে বংশী যেন বাড় ঘোরালো। ওস্তাদও কৈফিয়তের ভঙ্গীতে বললো—আজ বহুৎ মেহনত গেছে বংশী, শালা সিনামে পাসিনা, বলে বচন জামাটার সামনের জবজবে ভিজে দিকটা দেখায়। ওস্তাদের এসব যে বাহানা, তা বংশী ভালোভাবেই জানে, এ রোজই হচ্ছে, কম আর বেশী। ওকেও রান্নাবান্না শেষ করতে হবে, সময়তো একটু লাগবেই।

বংশীরও খিদে পেয়েছে। তাই কথা না বলে বাইরে চলে গেল।

সব কিছু গুছিয়ে শুতে শুতে ওস্তাদের আজ অনেক রাত হয়ে গেল। দুজনেই ঘুম ঘুম চোখ নিয়ে খাওয়াটা সারলো। খাটিয়া পড়তেই আর কারো সাড়া পাওয়া গেল না।

[২]

দুর্ দুর্ এই শালা গণ্ডগ্রাম, জঙ্গলে কেউ অফিস করে? ছ্যা ছ্যা, সাইট-অফিসের আর জায়গা পেলেনা সরকার! হেড অফিসের বুদ্ধির বলিহারী দেখ। ডেপুটেশনে সাব-ডিভিসনের কাছে এসে পঁয়ত্রিশ বছর সরকারী দপ্তরে রগড়ানো কেরানী আশু ভট্টাচার্য কথাগুলো বলে ওঠে। ওফ্ কি ধকলই না গেছে। সাবডিভিসনে ট্রান্সফার হওয়া কি আর চাটটি-খানি কথা? মানে প্রমোশন। মানে কি ধরাধরি করতে হয়েছে। যাই হোক মা কালী সহায়! মা মা বলে মায়ের উদ্দেশে দুটো হাত ঠেকিয়ে আশুবাবু বাড়ি থেকে আনা টিফিনের বাক্সটা খুলে রুটি আর কুমড়োর ছক্কা মুখে দিয়ে ডাকলেন—ও ফণী শুনছো—। ফণী ঝিমুচ্ছিলো বড়বাবুর ডাক শুনে তড়াক করে সিধে হয়ে বললো—বলেন! বুয়েচো, এবারে চেয়ারের ওপরে দুটো পা উঠিয়ে বলেন—বুয়েচো ফণী, একেবারে জঅংগোল।

—হ হ তা যা কইছেন।

শালা, এক কাপ চা দরকার হলে হাঁটতে হবে দশ মিনিট। বললুম—চায়ের ব্যবস্থা কর। কারেন্ট আছে। একটা হীটার কিনে নিয়ে এসো, তোমারো দুপয়সা আসুক, আমরাও খেয়ে বাঁচি।

করুম করুম এট্টু জইম্যা লউক, হে আর এমন শকতো কাম নাকি।
—তা একটু যাবে নাকি? মানে মোদ্দা কথাটা হোলো—চা আনানো, সেটা ফণী বোঝে, গেলাসটা উঠিয়ে বলে—য্যান, য্যান আমি যামু আর আমু। তবে এক্কেরে জঙ্গল, হেই কথাডা ঠিক হইল না বড়বাবু। আছে আছে, এড্ডু চোককান খোলা রাহেন তো দেহি। আশুবাবুর সঙ্গে

আপিস পিওন ফণীর সঙ্গে এসব মস্করা চলে।—তাই নাকি হে ফণী? কথার মধ্যে চাটনীর স্বাদ পেয়ে ভট্টাচায, ঠাকুর্দার আমলের রোল্ডগোল্ডের গোল চশমাটার ভেতর থেকে চোখটা নীচু করে ফণীর দিকে তাকায়। ফণী মুচকি হেসে চলে যেতে মুখে রুটি ঢুকিয়ে আশুবাবু চারপাশের জানলার এদিক ওদিক এক লহমা তাকিয়ে নেয়, সেরকম কিছু এই মুহূর্তে দেখতে না পেয়ে মনোযোগ দিয়ে টিফিন সেরে নিতে নিতে বলে —হতভাগ্যদের সব দিকে নজর। শকুন কো'াকার।

সেভাবে এখনো অফিসের কাজ শুরু হয়নি। ফলে একটা ঘরই গোছানো হয়েছে। তবে পরে বাড়ানো হব। একতলা সাবেকী ঢাউস বাড়িটার প্রায় দোতলার সমান আর একতলা বাড়ির ছাত রেলিং দিয়ে ঘেরা। ছাতের এক কোনে বিরাট একটা আঁশফল গাছ কার্নিশে ডালপালা ছড়িয়ে দিয়ে জায়গাটাকে প্রায় অন্ধকার করে রেখে দিয়েছে। তার পাশেই পুকুর। হয়তো কোনোকালে এই বাড়িরই ছিল। এখন এজমালি। পুকুরের এদিক-ওদিক ছড়ানো-ছিটনো খড়, খোলা, ও টিনের বাড়ি। ছাদের এপাশে দাঁড়ালে অনেক দূরে কেন্নোর মতো এঁকেবেঁকে নিঃশব্দ ইলেকট্রিক ট্রেন দূরে মিশে যায়। আরো দূরে ধোঁয়ার শহর কলকাতা। আর এ-পাশে রাস্তার কাজ চলছে দূরে সাঁকোর গা ঘেঁষা ঝিলে। মাথায় ফেটটি বাঁধা ধোপাদের কুমীরের লেজের মতো পাটাতনে কাপড় আছড়াবার তালে তালে অদ্ভুত শব্দ—ই শিউপ ই শিউউপ·········! আশ্চর্য! মুখের শব্দগুলো বাতাসে ভেসে এসে এ বাড়ির গায়ে মিলিয়ে যায়।

*   *   *   *

ঝুক ঝুক, ঝুক ঝুক রোলারের শব্দ। বচন এগুচ্ছে পেছুচ্ছে। পাশের বরোপিট থেকে মাটি কেটে এনে সার সার ঝুড়ি এসে পড়েছে রাস্তার লাইন বরাবর। মাঠে যেন আগুন ঝরছে। বচনের হাতে ষ্টীয়ারিং রোলার এগুচ্ছে পেছুচ্ছে। রাস্তার মাটি সমান না করলে মাপ হবে না, মাপ না হলে বিল হবে না। বিল না হলে কনট্রাকটারের

পেমেণ্ট হবে না। বচন এগুচ্ছে পেছুচ্ছে। একসময় ওস্তাদ ডাকলো—বংশী—পানি। বংশী বোতলটার ছিপি খুলে ওস্তাদের দিকে এগিয়ে দেয়। ডান হাতে ষ্টীয়ারিং ধ'রে বাঁ-হাতে ঢক ঢক করে সেটা শেষ করে দিয়ে দেয় বচন।

দিনটা ছিল বৈশাখের শেষ। মাঠের ওপরে বসানো বুড়ো-ঋষির মতো বাড়িটা বসে আছে জুবুথবু স্থির গায়ে, যেন সময় শ্যাওলার চাদর জড়িয়ে দিয়েছে। ধূলো উড়িয়ে নিয়ে আসছে পাগলা হাওয়া, কখনো এদিক কখনো ওদিক বাচ্চা ছেলের মতো ছুটোছুটি করছে। বাইরে ঠাঠা রোদে যেন ধাঁধাঁ লেগে যায়। এ সময়ে ঘরের জানলা কপাট বন্ধ করে রাখতে হয়। দক্ষিণ হু হু খোলা। দরজা বন্ধ করে রাখলে বাইরে থেকে উড়ে আসা ধূলোয় ফাইলপত্তর ভরে যাবে। তাই ইট দিয়ে দরজাটাকে একটু ফাঁক করে রাখা হয়েছে। ইটটাকে প্রবল আক্রোশে ঠেলতে চাইছে বাতাস। আছড়ে পড়ছে বারবার দরজায়। আসেনি আসেনি করে এখানে যে কজন লোক এসেছে তা মন্দ নয়। ক্রমশঃই কাজ বাড়ছে। আসছে মেশিন, মেকানিক, বাড়ছে ওয়ার্ক এ্যাসিটেণ্ট, ঠিকেদার কনট্রাকটর। মাটির সঙ্গে ধূলো হয়ে উড়ছে টাকা। এসেছে রোলার। এসেছে রোলার ড্রাইভার, তার হেলপার, তার গার্ড। এই রোলার ড্রাইভারের কথা মনে হতেই বড়বাবুর সামনে বচন সিং-এর মুখটা এসে দাঁড়ালো।—এই এক বিচ্চ্, তাঁদোড় এস্ছে। উনি আবার লীডার হয়েছেন। আরেক ছুঁচো আছে সঙ্গে চামচা। একদিন এমন বাঁশ দিয়ে দেবোনা, তখন ঠ্যালাটা বুঝবে। কোনো কেয়ার নেই, মুখের আগল নেই, পাশে এস-ডি-ও সাহেবের ঘর। যখন তখন হম্বি তম্বি, খিস্তি। সাহেব একটু টাইট হলে তখন বুঝতো ঠ্যালা। নিজের মনে বিড়বিড় করে আশু ভট্টচার্য—যাক গে বুঝবে। এদের আবার মাইনের বিলটা একটু মনোযোগ দিয়ে করতে হবে। গত মাসে বেদম ঝামেলা হয়েছিল। আর শালার অফিসও হয়েছে তেমনি। একটু ভুল হয়েছে কি হয়নি, দিলো দাগা মেরে বিল ফেরত। হুঁউম বুঝি বুঝি বাবা, আমি আশু ভটচায, বুঝি না জ্বালাটা কোথায়? তা পাঠা না, ফেরত পাঠা, কত

পাঠাবি পাঠা। আরে বাবা ভগবানেরও ভুল হতে পারে। ভগবানের ভুল ধরা আর আশু ভটচার্যের ভুল ধরা, ঐ এক। কালকা যোগী ভাতেরে কয় অন্ন। পঁচিশ বছর রগড়াচ্ছি কি এমনি এমনি। এই যে এত করছি, তাকি এই মুখ্যুগুলো বুঝবে ? কিছু হলেই এই টিপ-সইয়ের দল একসঙ্গে হামলে পড়বে। আর ওই যে, ওই এক বচন হয়েছে ন্যাতা। মারতে হয় এই এক থাপ্পড়। থাপ্পড় কথাটা বোধ হয় সবটুকু শেষ হয়নি, এই সময় পা দিয়ে ইঁটটাকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দু'আঙ্গুল দিয়ে কপালের ঘামটা চেঁছে পাশের দেওয়ালের দিকে ছুঁড়ে বচন সিং বললো—এ আশুবাবু মূলামূলজীর আনেকো কুছ খবর আছে ?

—সে আমি কি জানি, সে জানে সরখেল। তবে শুনেছিতো মাপজোক হবে। সরখেল তো তিন মাইলে গেছে। ও এলে ওকেই জিজ্ঞেস কোরো। সরখেল হোলো ওভারশিয়ার। মেজরমেন্ট বুকে ও কাজের মাপ-টুকে বিল করবে।

এক মিনিট কি ভেবে ও বললো—ঠিক হায়।

যেভাবে এসেছিল ঠিক সেভাবে দরজাটাকে হাট করে খুলে চলে গেল বচন।

বেলাটা প্রায় পড়ে আসার মুখে। দূর সাঁকোর ওপার থেকে পেট উঁচু পোর্টফোলিও ব্যাগটাকে বগলে জাপটে ধরে হাঁস-ফাঁস গোলগাল পরিচিত চেহারাটা দ্রুত আসছে—এক থেকে তিন মাইলের মাটি কাটার সিঙ্কি কনট্রাকটর মেসার্স মূলামূলজী এ্যাণ্ড ব্রাদার্সের বড় ভাই বিমল মূলামলজী। মূলামলজীর গাড়ি আছে, কিন্তু গাড়ি চড়ে ও কখনো কাজের জায়গায় আসে না। ঠিকেদারদের যত টাকাই থাক তারা খুব দরকার না পড়লে গাড়ি চড়ে না। চলনে বলনে কথায় বার্তায় এমন একটা গরীব গরীব ভাব দেখাতে হয় যাতে বাড়তি গুড় পিঁপড়েয় না খেয়ে যায়। ড্রাইভার থেকে শুরু করে বড়সাহেব পর্যন্ত এ কথাটার মানে জানে। তাই কনট্রাকটরদের বিলের জন্যেই এই অফিস। আর কি মাটি কাটা, কি ষ্টোন-চিপস, কি পিচ, সব জায়গাতেই ঐ বচন। আগে

মেজরমেণ্ট বুকে ম্যাপটা লেখা হয়ে তবেই বিলটা হবে তো। বচন নির্বিকার ষ্টিয়ারিং-এ মুখ রেখে আড়চোখে একবার তাকিয়ে আলতো গলায় বলে—দেবো শালা মচছড়্‌কে একদিন ভিড়িয়ে। কথাটা ঠিক বংশী বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করলো—কিছু বলছো ওস্তাদ ?

আরে এতো মিশিন আছে, হাঁ কি না ?

ঃ হাঁ ওস্তাদ।

—তা মেশিন তো গড়বড়িভী হোতে পারে ? হাঁ কি না ?

ঃ হাঁ ওস্তাদ।

—একটো বাত ইয়াদ রাখবি—শালা রোলার গড়বড় হোবে তো, পুরো কামভী—বন্ধ্‌। হাঁ কি না ?

ঃ হাঁ ওস্তাদ।

এবার শেষ পর্যন্ত বংশী বুঝালো কথাগুলো কার উদ্দেশে বলা।

—তু চাকা দেখ্‌নেমে কুছভী নেহি, মগড়, বংশী, এ লোহেকা বড়িয়া চাকা সব কামভী বন্ধ করে দিতে পারে। সমঝা ? বংশী বুঝলো। আরে মাটি সমান না হলে লিবেল হবে। মেটালিং ? পীচ ? মাটি কাটাই, ফির লিবেল। ফির মাটি। ফির লিবেল। ফির রোলার, ফির লিবেল। মাদারীকা খেল্‌।

হাঁপাতে হাঁপাতে সিন্ধ্রি ঠিকেদার মূলামলজী এসে হাজির হোলো। বচন রোলার থেকে বলে শালাম শেঠজী। হাঁ হাঁ—সালাম সালাম। এ কেয়া বাত বচন, আভিতক কাম কমপ্লিট ভি নেই হুয়া। তব্‌ বিল কা হালত হোগা ? ঘাম জমছে মূলামলজীর, পেটে বুকে কপালে। দরদরিয়ে ঘামে ভিজছে মূলামল। শেঠজীর অবস্থা দেখে হাসি পায়, কিন্তু নির্বিকার বলে—হোবে হোবে শেঠজী। কেয়া হোগা বচন, আজ সোমবার, শনিচার লেবার পেমেণ্ট। মর জায়গা, প্লিজ, জলদি করো। সরখেল সাব কো সাথ হাম বাতচিত কিয়া। তারপর বংশীর দিকে একঝলক তাকিয়ে মূলামল বলে—আরে এ বংশী ইধার আ। বংশী এ ডাকের মানে জানে। স্যুট করে পেছন দিক থেকে নেমে শেঠজীর সঙ্গে

পায়ে পায়ে হাঁটতে থাকে। একটু ঘেঁষেই চলে। মূল্যমলজী বুকের কাছে নিয়ে পোর্টফোলিওর বকলেসটা খোলে। রোলারটাকে এগুতে এগুতে ষ্টীয়ারীং-এ হাত দিয়ে একবার আড়চোখে তাকিয়ে বচন বলে—শালা মচছড়্।

হু'মাইল সীমানার ধার থেকে ওভারশিয়ার শৈবাল সরখেল আসছে ঠিক পাল তোলা নৌকোর মতো। সাদা জামাটা উল্টো হাওয়ায় ফুলে আছে। এবার বচন চাকাটার মুখ অফিসের দিকে ঘুরিয়ে নেয়; এই মানুষটাকে বচনের ভালো লাগে। সাফ সাফ কথা। হু'তিনবার এই ক'রে বদলী হয়েছে। কাউকে পরোয়া নেই। বদমাসি নেই, মাল ভী ছোড়ে গা নেই। বহুৎ দিলদার আদমী। গেটে ঢোকার মুখেই বচনের সঙ্গে দেখা। সরখেল হেসে বললো—শেঠজীকে দারুন টাইট দিয়েছো বচন। একদিনেই ভুঁড়ি কমে যাবে মূলামলের। আরে সরখেল সাব, এক বাততো মানেন? মার কা বদলা মার। সরখেল হেসে বলে তা যা বলেছো। তবে একেবারে মেরে ফেলো না।

গামছাটা ঘাড়ে গলায় মুখে মুছতে মুছতে বচন নেমে আসতেই সরখেল বলে—কিন্তু সাহেব জোর তাগাদা দিচ্ছে বিলের জন্যে। কাল পরশু বিল করতে পারবো তো? আরে হাঁ হাঁ সরখেলবাবু, কাল সুবাসে রোলার চলবে।

দিনশেষে বিকেল প্রায় শেষ হয়ে এলো। বচন সামনের বারান্দায় বসে প'ড়ে গামছা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হাওয়া খায়। এস. ডি ও সাহেব হুস করে জীপ ঘুরিয়ে বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই কিছুক্ষণের মধ্যে অফিস ফাঁকা। আজ হাটবার, বামুন গেল ঘর তো লাঙল তুলে ধর।

কাজকম্মো বলে তো এখন সেরকম কিছু নেই। তাই আজ তুজনেই একসঙ্গে বাজারে বেরুলো। বাজার মানে হাট। সপ্তাহে তু' বার বসে। একসঙ্গে সংসারের জিনিসপত্র তখনই ওরা কিনে নেয়। বংশী

হাঁটতে হাঁটতে বলে—একটা কাচার সাবান কিনতে হবে ওস্তাদ—কেন ? —জামা, প্যান্ট সব ময়লা হয়েছে। তু বড়া গন্ধা আছিস বংশী। সালভর্ এক প্যান্ট আর একটা জামা। নয়া একটো সেট খরিদ করতে পারিস না ? শালা মাখখিচুস্। বংশী হাসে। হাসলে ওর চকচকে মাড়িটা বেরিয়ে পড়ে। বলে—ওস্তাদ টাকা থাকলেতো কিপ্টে হবো। যার টাকাই নেই সে আবার কিপ্টে হবে কি করে ? কেন ? তোর তলব তো—হোয় ? —ওস্তাদ, আমার অনেক দায়িত্ব। টাকা আমি সব পাঠিয়ে দিই। তুমি না থাকলে না খেয়ে কবে ফুটে যেতাম। চুপ চুপ, বক্‌বাসী হামার ভালো লাগেনা। জানে, বচন জানে বংশীর টাকা কখনো ফালতু খরচ হয় না। বচনের আর কেইবা আছে। মূলামলজী আর সব ঠিকেদাররা যা টাকা দেয় তাতেই চলে যায় দোনো কা। তলব তো ফালতু, খামেই থেকে যায়। মাঝে মাঝে দেশে এক দাদী আছে, ও বুড়িকে কিছু টাকা পঠোতে হয়। বুড়ি বড়ো ভালোবাসে বচনকে। ভালবাসা ? পেয়ার ? বচন মাটিতে থুথু ফেলে বলে—হারামজাদ্, হঠাৎ গাল শুনে বংশী বলে—কি হোলো ওস্তাদ ?

কুছ নেহি, পোকা।

হাটে তাড়াতাড়ি যেতে হলে পাশের মেঠো পথটা দিয়ে সিধে যেতে হয়। বেলা পড়ে গেছে ব'লে বংশী ওই পথটাই ধরলো। বাঁকটা ঘুরতে না ঘুরতেই মুখোমুখি। চাঁপা কাঁখে ঘড়া নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। এ সময়ে হঠাৎ এ পথে ও কাউকে দেখবে আশা করেনি। চাঁপার কাপড়টা বিশ্রীভাবে হাঁটুর কাছে ছিঁড়ে আছে। ব্লাউজটার অবস্থাও প্রায় তাই। বাড়ির মধ্যে কে আর ভালো জামাকাপড় পরে থাকে। বংশীকে চাঁপা চেনে, টেপাকলে ওর সঙ্গে দেখা হয়। দু'চারটে কথাও যে হয়নি তা নয়। চাঁপা বংশীর থেকে দু' এক বছরের বড়োও হতে পারে। সুতরাং লজ্জাটা বংশীর জন্যে নয়। চাঁপা জানে ঐ লোকটা অফিসের লোক। ঐ লোহার গাড়িটাকে খোলা জায়গাটায় এপাশ ওপাশ করে। চাঁপা বেড়ার পাশে দাঁড়িয়ে দেখেছে।

হঠাৎ শব্দে জেগে যাওয়া গ্রামে প্রথম প্রথম কারো যেন দুপুরে ঘুম আসতো না। শব্দটা থেমে গেলেও কানে ভোঁ ভোঁ ক'রে বাজতো। এখন ব্যাপারটা সব সয়ে গেছে। এখন এখানকার লোকেদের শব্দ নাহলে ঘুম হয় না। এখন মনে হয় শব্দ-গুলো থেমে গেলে গ্রামটাও যেন আবার কখন থেমে যাবে। তাই চাকাটা চলুক। সব ব্যাপারটাই বুঝি এমনি করে সয়ে যায়। দেখতে দেখতে এই গ্রামটাও কখন যে শব্দের অংশীদার হ'য়ে পড়েছে। চাঁপা বংশীকেও দেখেছে চাকার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা একজন। চাঁপা থমকে দাঁড়ায়। সরু পথ। বচনও কয়েক মুহূর্ত থেমে থাকলেও চোখ কিন্তু থামে না। ঐটুকু সময়ের মধ্যেই বচন চাঁপাকে মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত জরিপ করে চলে যায়। ওস্তাদের এ চাহনি বংশীর ভালো লাগেনা। বংশী বলে—এদিকে একটু সরে এসো ওস্তাদ। ওস্তাদকে আর সরতে হয় না। চাঁপা-ই ভেরেণ্ডা গাছটার পাতা ঘেঁষে মুরগীর মতো লাফিয়ে ঘড়া কাঁখে চলে যায় টিউবওয়েলের দিকে।

—আবে চৌধুভিকা চাঁদ বে! এ চিড়িয়া কোথায় থাকে?—ঐ যে, চোখ আর আঙুল একসঙ্গে উঠিয়ে পাশের টিনের চালঅলা হেলেপড়া মাটির বাড়িটা বংশী দেখিয়ে দেয়। বচন আর কথা বলে না, ভাবে। খানিকটা পথ ওরা চুপচাপ হেঁটে যায়। এদিকে বচন কখনো আসেনি, এবার এই পথটাকে একবার ভালোভাবে দেখে নেয়। বংশীর প্রায় সব পথ পথঘাট চষা। দোকান-পাট, এমন কি লোকজনের নাম পর্যন্ত ওর জানা হয়ে গেছে। মেয়েটার নাম যে চাঁপা তাও সে ওস্তাদকে জানিয়ে দিয়েছে।—আর বংশী তু সালে বহুৎ চাল্লু? নাম ধাম মকান সব কুছ চিনিয়ে লিয়েছিস, লেড়কীউড়কী সব কুছ্? তুতো মেরা বাপ। ওস্তাদোকা ওস্তাদ। কি যে বলো, বংশী লজ্জা পায় বটে, তবে সঙ্গে সঙ্গে একটু গর্বও হয়, কারণ ওস্তাদ জানুক, বংশী এখন আর সেই বংশী নেই। বংশী এখন চালু হয়েছে। বংশীর এখন তাড়াতাড়ি কাজ শেখার দরকার। একটু তাড়াতাড়ি চালানোটা শিখলে ওস্তাদই

লাইসেন্সটা বের করে দিতে পারবে। ওর কতো জানাশোনা। তিন থেকে চার মাইলের মধ্যে যখন নতুন ঝকঝকে লাল রঙের ডিজেল রোলারটা আসবে, তখন তার ড্রাইভার হবে বংশীচরণ রায়। ওস্তাদি বললে অফিসে কেউ কোনো কথা বলতে পারবে? তারপর। তারপর···তারপরের কথা আর ভাবতে পারে না বংশী। ওর দুচোখ বুঁজে আসে।

—আরে এ বংশী, কি শোচ ছিস? ওস্তাদের ডাকে সম্বিৎ ফিরে আসে বংশী। —হাঁ, চাঁপা না কি বললি উ চিড়িয়াকা নাম? —কে চাঁপাদি। —হাইস্ শালা, ফির দিদি ভী বানিয়ে লিয়েছিস? তা আমার চেয়ে বয়সে বড়ো হলে ওকে দিদি না বলে কি নাম ধরে ডাকবো? —ন্না, ও বাততো ঠিকই আছে উসকী বাবাউবা কোঈ নেই। কেন থাকবে না, মনে হয় মিলে কাজ করে। আমি দু' একদিন যেতে দেখেছি। ওর ছোট ভাই, বোন, হিসেব করে গুনে বলে—তা প্রায় তিন চারজন হবে।—বাপ্ রে বাপ্, এত্তো জানিয়ে লিয়েছিস, আরে এ বংশী, তু কাম কাজ করবি, না পাড়া ঢুঁড়বি? মনে মনে এবার বংশী ভাবে এতো এক মহা ফ্যাসাদে পড়া গেল। উত্তর দিলেও জ্বালা। নাঃ, এবার চুপ করে থাকতে হবে। আবার চুপচাপ পথ হাঁটা। বচন এবার কি দিয়ে শুরু করবে ভেবে না পেয়ে হঠাৎ বলে ওঠে—মিরচা আছে? বংশী ঘাড় নাড়লো, না মানে ঘরে শুকনোলংকা নেই। আবার খানিক চুপচাপ।—বংশী, আজ তো কুছ্ আমদানী ভী হয়েছে, তো আজ খাসী বানা। বংশী ঘাড়টা আলতো করে হেলালো, মানে তুমি বললে ঠিক আছে। —আরে শালা তু আদমী না গধ্ধার। বচন এবার রেগে গিয়ে বললো কোনো বাড়তি বাত্ নেই।—বলছি তো। তুমি যা জিজ্ঞেস করছো, তার উত্তর দিচ্ছি। —হাঁহাঁ, উত্তর দিচ্ছি, এভাবে সওয়াল জোবাব হোয়? বংশী আর কথা বলে না।

আবার চুপচাপ।

টুকিটাকি অনেক জিনিস কেনার আছে। কিন্তু মুস্কিল হোলো একশো টাকার নোট ভাঙানো—শালা, মচ্ছড় বুরবক, শ'কা পাত্তি

ভিড়িয়েছে। এবার বংশী একটু সহজ হ'য়ে বলে—আমি বললুম শেঠজী, দশের পাত্তি দাও, তা বললো—অফিসে কিছু খুচরো পেমেণ্ট আছে।'

শেষপর্যন্ত এদিক ওদিক ঘুরে ওরা এক দোকান থেকে তেল ডাল থেকে শুরু করে সাবান পর্যন্ত কিনে নিল। দোকানটা বড় ছিল সুতরাং খুচরো হ'য়ে গেল। এখানে হাটবারে খাসী কাটা হয়। এর মধ্যেই একটা খাসীর সামনের রাঙ শেষ। আরেকটা পুরো রাঙটাই নিয়ে নিল বচন, ওজন প্রায় সেরদেড়েক হবে।—আরে এত মাংস কি কি হবে ওস্তাদ? —গোসটা খুব ভালো। আরে বুদ্ধু, মালের সঙ্গে শালা জমবে। ঠিক আছে ঠিক আছে, বাড়তি হো যায় তো, শুখা করে রাখিস, কাল রুটির সঙ্গে ফাসকেলাস হবে সব্জি-মাংস। জিনিষপত্র ব্যাগটার হু'মুখ এক হতে দিল না। দড়ি দিয়ে হুটোর মুখ বাঁধতে হোলো। এক প্যাকেট দামী সিগ্রেট কিনে এগিয়ে গিয়ে রিক্সা ডাকলো বচন —রিক্সা কি হবে ওস্তাদ? একটা এক নম্বর বোতল নিতে হোবে। ও মাল, হু নম্বর দিশি বিলাইতিকে হটিয়ে দেয়। রিক্শায় উঠে বচন সিগ্রেটটায় লম্বা একটা টান দিয়ে বলে—চৌরাস্তা।

ওরা যখন ফিরলো তখন ঝিঁ ঝিঁর অর্কেষ্ট্রা শুরু হয়ে গেছে। চাঁদের আলোয় ভুতুড়ে মানুষগুলোকে দূর থেকে দেখতে পেলো ওরা। অন্ধকারে যা দেখা যায় না। এখন হুধের বাটির মতো চাঁদের উপুড় করা আলোয় জায়গাটা কে যেন রহস্যময় করে তুলেছে। জায়গাটা বাইরের কোনো অঞ্চল বলে মনে হচ্ছিলো। যা কলকাতা নয় বা বাংলা নয় এমন কি যেন ভারতবর্ষও নয়। বচন দাওয়ায় বসে রইলো খানিকক্ষণ। ওখানে শহর হবে। নাম হবে সল্ট লেক সিটি। এতো অদ্ভুত মতলব কথা কার মাথা দিয়ে যে এসেছিলো বচন জানে না। বচনদের জানার কথাও নয়। ওখানে বসেই ডাকলো— বংশী। উত্তর এলো না। আরে এ এ বংশীইই···। জবাব নেই। —আরে বংশী তু কি গায়েব হয়ে গেলি? বচনের মেজাজ খিঁচড়ে

যেতে ও উঠে ঘরের দিকে পা বাড়ালো। হ্যারিকেনটা জ্বালানো রয়েছে। বংশী উবু হয়ে জনতাটাকে নিয়ে কী যেন একটা কারিগুরী করছে, কি করছে কে জানে। বচন ঘরে আসতে ও এবার ফ্যাকাশে হয়ে বলে—বড় কসুর হয়ে গেছে ওস্তাদ। আরে কি হ'লো বলবিতো! কা হুয়া? —ওস্তাদ কেরোসিন কেনা হয় নি। —হায় রাম। বচন এবার কপাল চাপড়ে ধপ্ করে খাটিয়ায় শুয়ে পড়লো। —বেত্মিজ কড়ুয়া তেল ইয়াদ ছিল, কেরোসিন নেই? হাতটা বাড়িয়ে আঙুল-জড়ো করে নাড়াতে নাড়াতে বচন বলে···সর্ষে তেল দিয়ে কি তু জনতা জ্বালাবি? হতাশ হয়ে বংশীও ভাবে, কি হবে? সত্যিই তো সর্ষের তেল দিয়ে তো আর স্টোভ ধরানো যায় না। তাহলে? তাহলে? হঠাৎ বংশীর মাথায় কী যেন একটা বুদ্ধি খেলে গেল। ও তেলের বোতল নিয়ে বলে—এক মিনিট দাঁড়াও ওস্তাদ, আমি আসছি।—আরে পয়সা লিয়ে যা, দোকানভী তো দূর আছে।—দাঁড়াও ওস্তাদ, এক মিনিট। এক মিনিটতো একটা কথার কথা, বচন খাটিয়া থেকে উঠে ভেজা জামা প্যাণ্ট গেঞ্জী সব ছেড়েছুড়ে খালি গায়ে লুঙ্গী প'রে, খাটিয়ার উপর বসে জোরে জোরে হাত-পাখাটা নাড়িয়ে নিয়ে নিজেকে হাওয়া করতে শুরু করলো। কিছুক্ষণ বাদেই বংশী এসে হাজির। আর আশ্চর্য হয়ে বচন দেখলো, ওর হাতে শিশি ভর্তি কেরোসিন তেল—আরে ব্বা, তাজ্জব কি বাত! কিধারসে লিয়ে এলি রে? বংশী মুচকি হেসে বললো—বলবোনা।—আরে আস্লি বাত্ বাতাতো ইয়ার! আরে তুমি আগে বলো না।

ঃ কেয়া জানে। ঠোঁটের সঙ্গে কাঁধটা ঝাঁকুনি দেয়।

—বলই না। বংশী স্টোভে তেল ভরতে ভরতে বলে—একটু ভেবে বলো। ওস্তাদ! বচন ভাবতে বসে, ভেবে ভেবে কোনো খেই না পেয়ে বলে—না, মালুম নেই।

—আমি বলবো।

ঃ আরে জল্দি বোল্।

—চাঁপাদি। অর্কেষ্ট্রা একটু ঝিমিয়ে ছিল, বচন, চাঁপা শব্দ শুনে

প্রায় তড়াক করে সিধে হয়ে বসে, চোখটা বড় বড় করে খানিকটা অবাক হয়ে যাবার ভঙ্গীতে একই কথা জিজ্ঞেস করে—কেয়া বোলা ?—বললুম তো চাঁপাদি, চাঁপাদি, চাঁপাদি, তালে তালে তিনবার জোর দিয়ে বংশী কথাগুলো বলে যায়। বচনের হাঁ আর বন্ধ হয় না। তুমি বলেছিলে না—ওস্তাদকো ওস্তাদ ? মনে পড়ে ?

হাঁ হাঁ জরুর বাবা মান লিয়া।—জানো ওস্তাদ, মাঝেমাঝেইতো চাঁপাদির সঙ্গে কলে দেখা হয়। লোকের মুখে নামটাও জেনে নিয়েছিলুম, একবার ডেকেও ফেলেছিলুম। সেদিন ছুম্ করে হিসেব মতো আমারই আগে জল নেয়ার কথা, তা সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছিল বলে চাঁপাদিকে ছেড়ে দিয়েছিলুম। তা, একটা উপকার করা হোলো তো ? বচন মাথা নাড়ে, বলে—জরুর, ঠিইক্। আজ ভাবলুম যখন বিপদে পড়েছি, তখন একটু তেল ধার চাইলে কি হয়। মাথা ঠুকে চলেই গেলুম ! মুখের ওপর কি একেবারে না করে দেবে ? বেড়ার ধার থেকে ডাকলুম নাম ধরে। বেরিয়ে এলো। চাইলুম, একটু ভেবে চাঁপাদি হাত থেকে শিশিটা নিয়ে গেল। তারপর ভুরুটা দু-তিনবার নামিয়ে-উঠিয়ে বংশী বলে, তারপর কি দেখছো, বলো। বচন ভ্যাবাচ্যাকা হয়ে উত্তর দেয়—কী ?—কী সুন্দর সবকটা পলতে একসঙ্গে কেমন জ্বলছে, বচনের হাঁ টা আব বন্ধ হোলো না। তারপর, তারপর, হঠাৎ বচন যেন চেঁচিয়ে বলে—শালা, কাল তু তেল আপোস দিয়ে আসবি। পাড়াকা দামাদ হয়েছিস, যার কাছে যা মাঙবে, তাই পেয়ে যাবে। কেয়া বাত্ সমঝা ? ওস্তাদের হম্বিতম্বি দেখে এবার বংশী হেসে ফেলে। জানে, ওস্তাদের এটা কপট রাগ। এ রাগে কোনো ঝাল নেই, এটা বকুনি নয়, এ রাগ হাল্‌কা ধোঁয়ার মতো ঘরের ঘুলঘুলি দিয়ে উড়ে যায়। এ-রাগ না দেখালে বংশী কবে এখান থেকে সটকে যেতো। রাগ নয়, এটা হোলো দোস্তি। বংশীকে এবার আর বলতে হয় না, জলভর্তি মগ, গেলাস, আর বোতলটা বগলে ক'রে বাইরের দাওয়ায় গিয়ে রেখে আসে। বংশীর চেয়ে বয়সে অনেক ছোট

বাধ্য ছেলের মতো হাঁটি হাঁটি পায়ে পায়ে দাওয়ার দেওয়ালে হেলান দিয়ে বচন দূরের প্রান্তরের দিকে তাকায়। চাঁদটা যেন কায়দা ক'রে থিয়েটারের ফোকাসের মতো ওদিক থেকে ঝুলে রয়েছে। বংশী সবকিছু ওস্তাদের সামনে গুছিয়ে রেখে চলে যায় ঘরে, আবার ফিরে আসে। ওর হাতে এবার শক্ত কাগজে রাখা আদা-পেঁয়াজ নুন আর একটু বাদাম, হাট থেকে নিয়ে এসেছে। ওস্তাদের চাট বংশী জানে। কাগজটা মগের পাশে নামিয়ে রেখে বংশী বলে—একটু আস্তে আস্তে মেরো ওস্তাদ। আজ খানা পাকাতে একটু দেরি হবে—হাঁ হাঁ ঠিক আছে, আভি ভাগ্। খানিকক্ষণ ওপারে আলোয় তাকাতে তাকাতে হঠাৎ বচনের মুখ থেকে কাক তাড়ানোর ভঙ্গীর মতো বেরিয়ে যায়—হুস্ শালা তারপর বোতলের পেছনে পর পর দু-তিনটে থাবড়া মেরে ছিপিটা খুলে ফেলে কাঁধের গামছাটার একটা খুঁট দিয়ে ছেঁকে গেলাশটা অর্ধেক করে। তারপর একটু জল ঢেলে এক চুমুকে সবটুকু গলায় ঢেলে দিয়ে মুখ কুঁচকে বলে—হায় রাম। খাও, পিও, জিও।

পরের দিন ভোরবেলাতেই বেরিয়ে গেল বংশী। একেবারে সেই বাসস্ট্যাণ্ডের পাশের দোকানে। উফ্, কাল যা বিপদে পড়েছিল বংশী। এবার আর বোতলটোতল নয়, ডিজেলের পুরো টিনটায় ভর্তি ক'রে নিয়ে এলো কেরোসিন। এনেই চুপ ক'রে নেই, শিশিটা ভর্তি করে ছুটলো চাঁপাদির বাড়ি। একটা ছেঁড়া মাদুরে ব'সে দু-একজন তারস্বরে চীৎকার করছে, মনে পড়ছে। কী পড়ছে বোঝা যাচ্ছে না, পড়া থেকে সমস্বরে এ্যা-এ্যা শব্দটাই শোনা যাচ্ছে বেশি। চাঁপাদির মা বোধহয় ঘাটে গেছে। আশপাশ থেকে কাঠকুটো এনে রান্নাঘরে কাঠের উনুনটা চাঁপাদি ধরাবার চেষ্টা করছে। পেতলের লম্বা একটা নল ফুঁ দিয়ে বেখারি কঞ্চিগুলোকে জ্বালাবার চেষ্টা করছিল চাঁপাদি। চোখেমুখে উঠোনে, ধোঁয়ায় ধোঁয়াক্কার, চাঁপাদির মুখটা ভালোভাবে দেখা যাচ্ছিল না। বংশী ধোঁয়ায় কাশতে কাশতেই ডাকলো—চাঁপাদি। হঠাৎ চেনা গলায় তার নাম শুনে, এ্যাশসাওড়া বেড়ার

পাশে এসে দাঁড়িয়ে হাতে তেলের শিশিটা দেখে বললো—বাব্-বা, রাতে ঘুম হয়েছিল তো? বংশী হেসে ফেলে, বলে ধার যত তাড়াতাড়ি শোধ দেয়া যায় ততই ভালো। চাঁপা হেসে বললো—বিরাট ঋণ তো, পরে দিলে হাতকড়া পড়ে যেতো। হঠাৎ বংশীকে দেখে ভাইবোনোদের চীৎকারটাও থেমে গেল। বংশী দাওয়ায় শিশিটা রেখে চলে আসবার সময় চাঁপা পিছু ডেকে বলল—এই, এইযে, শোনো শোনো, ডাক শুনে বংশী ঘুরে দাঁড়িয়ে বললো—খারাপ হোক, ভালো হোক একটা নাম আছে আমার, সবাই ডাকে যে নামে সেই নামটা হলো বংশী। —তা নাম না জানলে এই এই বলে ডাকবোনাতো কি? যাক্‌গেবাবা ঘাট হয়েছে। শোনো, আমার একটা উপকার করবে? বলুন, করার থাকলে নিশ্চয়ই করবো। করবে মানে একেবারে হাতের কাছে উপকার করার এমন সুযোগ আর পাবে না। তোমরা সুতোর মতন গোছটোছে মেশিন নিয়ে পরিষ্কার-টরিস্কার করো না? কি যেন নাম, ভুলে গেছি। তোমরা ফেলে দাও। সেদিন নন্দু, হাতে ক'রে একগোছা নিয়ে এসেছিলো। কি যেন নাম।—ও হো, জুট? প্রচুর দিয়ে উপকার করবো। আর? আর তোমাদের মেশিনের তেল উনুনে দিলে দারুন জ্বলে।—তাও দোবো প্রচুর। আরে ওসব তো আমার আন্ডারে। অর্থাৎ চাঁপাকে বংশী বুঝিয়ে দিল, সেও সরকারের অফিসে নামলেখানো একজন লোক। কথাটা বলতে বেশ গর্ব হচ্ছিলো বংশীর।

—দেবে তো?

ঃ হ্যাঁরে বাবা, বলছিতো এটা কি একটা শক্ত ব্যাপার?

—মনে থাকবে?

ঃ একশোবার।

—আর তেল?

ঃ তাও মনে থাকবে। এবার চলি? বংশী বেরিয়ে যেতে চাঁপা পায়ে পায়ে ভেড়েণ্ডার বেড়াটায় হাত দিয়ে ওর চলে যাওয়ার পথের দিকে চোখ রাখলো। ছেলেটার ওপর কেমন যেন একটা মায়া পড়ে গেছে।

জুটের কোন হিসেব নেই। একখামচা নিয়ে কাজ চালালেই হোলো। সরকারি মাল গুদামের এক কোণে ডাঁই হ'য়ে পড়ে আছে। জুটটা নিয়ে এসে রোলারের এক ফাঁকে রেখে দিল বংশী। একটা ডালডার টিন জোগাড় ক'রে, তার মুখটাকে সমান করে কেটে রোলারের সামনে গিয়ে বললো, ওস্তাদ একটু ডিজেল লাগবে। —কেন? মিশিনে ডিজিল তো আছে। না ওস্তাদ গাড়ির জন্যে নয়, আমার দরকার। বচন রোলারটার ভেতরে একটা নাট টাইট করছিলো, মুখটা না তুলেই ওখান থেকে উত্তর দিলো, তুর দরকার? কেন? একজনকে দিতে হবে।—ডিজেল? কেয়া জরুরত? কাকে দিবি? চাঁপাদি চেয়েছে। —কোউন্? ওস্তাদ এবার ভেতর থেকে ঘাড়টা উঠিয়ে বংশীর দিকে তাকিয়ে হেসে বললো—তুর চাঁপাদির বাড়িতে কি মিশিন আছে রে শালা, লাভ্-মিশিন, ডিজেলে চলে?—যাও ওস্তাদ, ইয়ার্কি কোরো না, উনুন ধরাবে। লেবে, লিয়ে লে, গরমেণ্ট কা মাল, দরিয়ামে ঢাল। বংশী অনুমতি পেয়ে চলে যায়।

দুপুরের এক ফাঁকে ওস্তাদকে খাইয়ে টুক্ করে পেছনের খিড়কির দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল বংশী। বেড়ার ধারে উঁকি মেরে দেখলে চাঁপাদিরা খেতে বসেছে। এসময়ে ঢুকবে কি ঢুকবে না এক লহমা ভেবে নিয়ে হুট্ করে কঞ্চির বেড়াটা ঠেলে ঢুকে পড়তেই বংশীকে দেখে চাঁপাদির মা বাঁ হাত দিয়ে ঘোমটাটা একটু নামিয়ে বললো—কে?

—আমি বংশী।

—ও বংশী। চাঁপাদির মা আশ্বস্ত হয়ে মাথা থেকে ঘোমটা একটু সরিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করলো—ছেলেটা কে রে? চাঁপাদির মা বংশীকে দেখেছে কিন্তু এত সামনাসামনি কখনো দেখেনি। হঠাৎ আসাতে ভাতের থালা নিয়ে মার একটু সংকোচ ছিল, কিন্তু চাঁপাদির কথাবার্তায় সেটা প্রায় একেবারেই উবে গেল।—আরে এসো এসো, বংশী দাওয়ার সামনে এগিয়ে আসে। থালার ওপরে কি সব শাকপাতা ডাঁটা দিয়ে একথ্যাবড়া ঘ্যাঁট, আর রুটি। কোণে বোধহয় সামান্য ভাতের মতো কিছু

হবে। সব মিলিয়ে বংশীর সকালবেলার নাস্তার মতো। তবু চোখে মুখে কোন সংকোচ নেই।—বাবা, তোমার খাওয়াদাওয়া হয়েছে তো? —আমাদের আবার গুছিয়ে খাওয়াদাওয়া। সময় নিয়েএকবার ওটা সেরে নিলেই হোলো।—এতটুকু ছেলে এখানে এসে কাজ করছো, তোমার মা-বাবা নেই? বংশী এবার হো-হো করে হেসে বলে, মা-বাবার কথা বলছেন মাসীমা? তাঁরা ভালো আছেন, একজন সৎ, একজন অসৎ। ফলে আমার থাকা না থাকা, বাঁচা-না-বাঁচায় ওদের কিৎসু এসে যায় না।

—আহা রে। চাঁপাদির মার গলায় মায়ের মমতা ঝরে পড়লো। হাওয়াটা একটু ভারি হয়ে যাচ্ছে দেখে চাঁপাদি হঠাৎ হেসে বলল, যখন এনারা সব কাজ করবে না মা, তখন একবার দেখো। দেখবে, ইচ্ছে করলে এরা গোটা গ্রামটাকেই পিষে দিতে পারে। তুমি আর অত আহা আহা কোরো না। এবার বংশী হেসে বলে—আপনাদের বুঝি তাই ধারণা, না?—ওস্তাদ শুনলে হাসবে।—ওস্তাদ আবার কে-গো, চাঁপাদির মায়ের মুখে কথাটা যেন বেখাপ্পা ঠেকে।—আরে ওস্তাদ ওর গার্জিয়ান ওস্তাদ মা, বুঝেছো, ওনার গুরু। ঐ যে বড়ো গাড়ি চালায় বিহারীটা। ওস্তাদের জাত সম্পর্কে চাঁপা একটা কথা বলে। ওস্তাদ সম্পর্কে এ-কথাটা বলা চাঁপাদির ঠিক হোলো না, বংশী একটু রেগে বলে, মানুষের আবার জাত আছে নাকি?—ওমা তাবলে বাঙালীকে বাঙালী, অমুককে অমুক বলবো না, তা কি হয়? বংশীর চাঁপাদিকে এখন আর ভালো লাগছে না, মাঝখানে কথা থামিয়ে ও বলে—এখন যাই। গেটটায় যাবার আগেই চাপাদির খিলখিলিয়ে হাসিটা কানে যেন অপমান হয়ে বাজলো। দূর, ওস্তাদকে যে অপমান করে তাদের দিকে বংশী চেয়েও দেখে না।

জল আনবার সময়টাই বংশী পাল্টে দিল, এখানেই চাঁপাদির এক সময় এক সঙ্গে দেখা হয়, কথা হয়।

বংশী খুব ভোরে আর রাত্রে গিয়ে জলটা নিয়ে আসে। ওস্তাদকে না বললেও অপমানটা বংশী যেন এখনো ভুলতে পারছিল না।

সেদিন অত ভোরে চাঁপাদিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বংশী একটু অবাক হয়ে গেল বটে, তবে অপমানটা গা থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারেনি ব'লে বোধহয় ও পাশ কাটিয়ে চলে যেতে চেয়েছিল। চাঁপাদি সেটা বুঝেই একটু অসহায়, অস্ফুট গলায় ডাকল, এই বংশী একটু কথা শুনবে, খুব দরকার আছে। এ চাঁপাদি অন্যরকমের, অসহায়, বিমর্ষ, কেমন যেন ফ্যাকাশে।—আমাদের বড়ো বিপদ, একটু উপকার করলে? বংশী যেতে গিয়ে দাঁড়িয়ে চাঁপাদির মুখের দিকে একবার ঘুরে তাকালো। একটু ভেতরে এসো। বংশী পায়ে পায়ে চাঁপাদির পেছন পেছন গেল।—কি হয়েছে বলতো বংশীর গলায় এবার উৎকণ্ঠা, আর এই প্রথম বংশী মুখ ফস্কে চাঁপাদিকে তুমি বলে ফেলল।

কি হয়েছে চাঁপাদি?

বংশী, নন্দুর বড় অসুখ। বড্ডো ভয় করছে।

ক'দিন হোলো?

—তা প্রায় সাতদিন হয়ে গেল।

সা—আত দিইন? বংশী আঁতকে উঠে বললো, এর মধ্যে একবারও খবর পাঠালেন না?—কি করবো বলো খবর পাঠাবার মত তো আমাদের কেউ নেই, আর তুমিও আসো না, চাঁপাদির ওপর রাগ করে বসে আছো। তারিণীকাকাও অনেক দিন আসছেন না।—তোমার বাবা? বংশী বিস্ময়ে কথাগুলো বললো—তোমার বাবার তো এখন অফিস ছুটি নেওয়া উচিত চাঁপাদি, ছেলের অসুখ।—বাবা? চাঁপাদি ঠোঁটের কোণায় ঘৃণার হাসি এনে বললো—জানো বংশী, বাবার সঙ্গে যারা কাজ করে তারা প্রায় সবাই বাড়ি মানে নতুন একটা মাথা গোঁজার ঠাঁই করে নিয়েছে, তারা ভাবে, তাদের একটা সংসার আছে, তারা খাটে। ওভারটাইম করে, সময়মতো অফিস যায়। আর আমার বাবা, সন্ধ্যে হলেই মদ, সংসার তার কাছে ছেলেখেলা। ছেলেমেয়ে তার কাছে বাড়তি ঝামেলা। মা বলে। যখন বেশী মাত্রায় বলে তখন মাকে বাবা ধ'রে মারে। দেখি, কিন্তু কিছু বলতে পারিনা। শত হলেও বাবাতো।

তাই ভাবি, বাবার বোধ হয় চোখ খুলবে, যেদিন, সেদিন আমরা একজন না একজন কেউ মরে যাবোই।

—ছিঃ ও কথা বলতে নেই চাঁপাদি। ওতে অমঙ্গল হয়। অমঙ্গলের-টমঙ্গলের কথা তুলে রাখো, তুমি কি আমায় শ্যামবাজোরের বড় ডাক্তার বাগচী বাবুর কাছে নিয়ে যেতে পারবে? তার ঠিকানা আমার কাছে আছে, বাবা যখন মানুষ ছিল তখন গেছে, ওষুধ এসেছে, কিন্তু আমিতো একলা কখনো যাইনি। এখন নন্দুর জন্যে না গেলে নয়। বংশী, আমার ভয় হচ্ছে, ও বোধ হয় বাঁচবে না।

বংশী কথাটা থামিয়ে দিয়ে বললো—ও কথা বলো না চাঁপাদি অসুখতো সব্বারই হয়। না বংশী, কেমন কেমন যেন মনে হচ্ছে, ছেলেটা দিনকে দিন নেতিয়ে পড়ছে, মা-ও খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দিয়েছে, আমি যে এখন কি করি। আমাকে তুমি একবার ডাক্তারবাবুর কাছে নিয়ে চলো। বংশী, তোমার দুটো পায়ে পড়ি। ছিঃ ছিঃ ছিঃ, কি বলছো চাঁপাদি, আমি এক্ষুনি আসছি। জল আনা আর হোলো না, বালতিটা ঘরের কোণায় রেখে দিয়ে বংশী নিজের টিনের বাক্সটা খুললো। ওস্তাদ এখনো ঘুমোচ্ছে। থাক্ ওস্তাদকে ডাকার আর দরকার নেই, এক্ষুনিতো ফিরে আসবো।

ডাক্তার বুক, পিঠ, জিভ গম্ভীরভাবে পরীক্ষা করে বললো—কত বয়স? একটু হিসেব করে চাঁপাদি বললো—সাত বছর তিন মাস হবে। কদ্দিন হয়েছে? তা প্রায় সাত আট দিন। ডাক্তার হঠাৎ রেগে গিয়ে চীৎকার করে বললো—এ্যাদ্দিন বাড়িতে ফেলে রেখেছেন, পেশেণ্টকে দেখাননি কেন? চাঁপাদি চুপ করে থাকে। সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী মহিলার শরীরের দিকে চেয়ে বোধহয় ডাক্তারেরও মায়া হয়। বলেন—আপনাদের বলিহারি—একেবারে সিরিয়াস নাহলে আমাদের কাছে আসবেননা। চাঁপাদি আলতো গলায় বললো—এতদিন কবিরাজ মশাই দেখছিলেন। —তাহলেতো হয়েই গেল, ডাক্তার খিঁচিয়ে উঠে বললেন—তাহলে এখনো গিয়ে আবার সেই কবিরাজকে দেখান। এখানে এতো কষ্ট করে এলেন কেন? শুনুন, রুগীর রক্ত, স্টুল, আর ইউরিন পরীক্ষা করতে হবে। অনেক টাকার ব্যাপার, রুগীকে

বেশী নাড়াচাড়া করবেন না। ট্যাক্সি নিয়ে আলতো করে আপনাদের কারো কোলে মাথা রেখে শুইয়ে নিয়ে যান, ওষুধ দিয়ে দিলাম সাত-দিনের, সাত দিন বাদে আবার নিয়ে আসবেন। ফি গুনে নিয়ে ডাক্তার অন্য আরেক রুগীর গায়ে স্টেথিসস্কোপ বসালেন।

নানা ধরনের ওষুধ। কোনটা খাওয়ার আগে, কোনটা খাওয়ার পরে। কোনটা খাওয়ার মাঝখানে। কোনটা বা জলখাবারের পরে, সে সব এলাহী ব্যাপার। চাঁপার হাতে গোটা পাঁচ ছয় টাকা আর কিছু খুচরো পয়সা হয়ত আছে।—কি হবে বংশী?—ভগবানকে ডাকো চাঁপাদি, ব্যবস্থা একটা হয়ে যাবে। ভাগ্যিস বুদ্ধি করে বংশী কিছু টাকা টিনের তোরঙ্গ থেকে বের ক'রে নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু এ টাকাতে সবকিছু কেনা যাবে না, তারপর বাড়তি হিসেবেও তো কিছু আছে। ট্যাক্সিটা থামলো। বংশীর কোলে মাথা রেখে নন্দু বাড়িতে ফিরে এলো। নন্দুকে শুইয়ে দিয়েই বংশী চাঁপাকে বললো—ওষুধগুলো যে আনতে হবে চাঁপাদি? —কিন্তু বাবা না এলে, অর্থাৎ টাকা। বংশী জানে—বাবা এলেও সে টাকা কখনো পাওয়া যাবে না। কিন্তু টাকা বাবা দিক বা নাই দিক, ওষুধগুলো এখনই কেনা দরকার। —বংশী, চাঁপাদি বললো—তোমার ওস্তাদকে ব'লে কিছু টাকা ধার দিতে পারো? ঠিক আছে চাঁপাদি, আমি বলে দেখি। বংশী বেরিয়ে এসে ঘরে ঢুকে দেখলো ওস্তাদ গুম মেরে বসে আছে। সকালের নাস্তা হয়নি। দুপুরের খাবারের ঠিক নেই। বংশী ঢুকতে না ঢুকতেই ফেটে পড়লো বচন,—আবে গাধ্বা, সুবা সুবা কোথায় গায়েব হ'য়ে গেলি।

—ওস্তাদ কিছু টাকা দাও।

দিল্লাগী হচ্ছে?

ওস্তাদ ভীষণ দরকার, চাঁপাদির ভায়ের খুব অসুখ। বহুৎ বড়া বেরাম।—ওফ্ শালা, চাঁপাদি, চাঁপাদি, চাঁপাদি। তুম হামকো খতম্ করে দেগা।—ডাকতারখানায় যেতে হবে ওস্তাদ।—রুপেয়া লে যা। বংশী ওস্তাদের বাকসো খুলে গোছা নোট নিয়ে নেয়। কিছু খেয়ে নাও, আজকের দিনটা তোমায় কিছু করে দিতে পারলাম

না ওস্তাদ, একটাবেলা যাহে'ক ব্যবস্থা করে নাও। আমাকে এক্ষুনি যেতে হবে। বংশী হাওয়ার মতো দরজা দিয়ে আবার বেরিয়ে যায়। ট্যাকসি করে আসতে যেতে যা সময়, তার মধ্যে বংশী ওষুধ নিয়ে ট্যাকসি করে এলো, প্রায় ডবল ভাড়া দিয়ে।

বংশী ওষুধের সঙ্গে বুদ্ধি করে ফলও কিনে এনেছে। এনেছে আপেল মুসুম্বিলেবু। চাঁপা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে বংশীর দিকে, কৃতজ্ঞতায় না প্রেমে বোঝা যায় না। চাঁপাদির মা, সেতো নির্বিকার যেন পাথর হয়ে আছে। রুগীকে ওষুধ আর পথ্যি ক'রে, যখন ক্লান্ত হয়ে বংশী ঘরে ফিরে আসছে, তখনই মাঠের ওপারে শুনলো, রোলারের ঝুক ঝুক শব্দ। রোলার এগুচ্ছে পেছুচ্ছে, সমান করে দিচ্ছে মাটি।

ওস্তাদ, তোমাকে হাজার সেলাম।

রুগীর পাশে রাত জাগতে হয়, চাঁপাদি, মাসীমা, এমন কি চাঁপাদির বুড়ি পিসীমা অবধি ক্লান্তচোখ তুলতে পারছে না, তবু কেউ মুখ ফুটে বলবে না। বাবা যে কোথায় থাকে, কখন আসে, কখন যায় আজ পর্যন্ত বংশী তার হদিশ পায়নি।—বাবাকে তুমি আমাদের মধ্যে ধোরোনা বংশী। পাল্টাতে পাল্টাতে সে এখন অন্য মানুষ হয়ে গেছে। তার কাছে আমরা এখন অনেক দূরে।

বংশীর জমানো টাকা প্রায় শেষ।

ওস্তাদের রেস্ত বাড়তে বাড়তে এমন এক জায়গায় এসে এখন পৌঁছেছে, যেখানে আর নতুন করে টাকা চাওয়া যায় না বংশীরই এখন লজ্জা করে। অথচ এখনো চাঁপাদির বাবা রাত করে ঘরে ঢোকে, মৌরি চিবোয়। তারপর একসময় দাওয়ার মাদুরে মুখ রাখে।

এসব দেখে বংশীর মাঝে মাঝে মাথায় আগুন জ্বলে উঠে হঠাৎ নিভে যায়। ভাবে অভাব যারা ডেকে আনে তারা অভাবের মধ্যেই থাকতে ভালবাসে। তাই কখনো কখনো চাঁপাদির বাবার সঙ্গে ওস্তাদের পরিচয় করিয়ে দিতে ইচ্ছে করে, যে অভাব বলে সংসারে কোনো

কথা আছে ওস্তাদ বিশ্বাস করে না। ভাবে বংশী কিন্তু সাহস হয় না। তবু দুঃখের সংসারে কখন যেন ভগবান পাশে এসে দাঁড়ায়। তা না হলে নন্দু কি করে ভালো হয়ে ওঠে? আবার হাসিমুখে উঠে দাঁড়ায়। দুঃখের আগুনে পুড়ে চাঁপাদির মতো মেয়েরা কেমন নিখাদ সোনা হয়ে ওঠে।

*　*　*　*

ইতিমধ্যে বর্ষা নেমেছে। দূরের আকাশে ভেড়ার মতো মেঘগুলো কালো রঙে সেজেগুজে আছে। তারপর গুড়-গুড় গুড়-গুড় ক'রে ফুঁসে ওঠে। দূরের প্রান্তরে বর্ষার অজস্র ফোঁটা, কে যেন চালুনি দিয়ে ঝাড়তে থাকে। সারাদিন টিপ টিপ ঝির ঝির ঝরেই চলেছে। কাঁচা রাস্তার ওপরে ভিজে কাদা হ'য়ে যায়। এ সময়ে রোলার চলে না। চললে মাটি কামড়ে চাকায় উঠে আসে। ভারী চাকা মাঠের কোনো জায়গায় নেমে যায় ভসভসিয়ে। শুধু রোলার কেন এ সময়ে গোটা অফিসটাই যেন ঝিমিয়ে পড়েছে।

এখন আর রোলারের শব্দ শোনা যায় না। এখন যা কাজ আছে তা হোলো রাস্তার ধারে ধারে উঁচু ক'রে কাটা মাটি যাতে বর্ষার ধুয়ে না যায় তার জন্যে ঘাসের চাপড়া দিয়ে করা হয় টার্ফিং। করে ঠিকেদারেরই লোকজনেরাই। বরোপিটে বর্ষার জমে থাকা জল দিয়ে করে মেটালিং। রাস্তার কাজে যা না হলেই নয়। তাই ঠিকেদারেরা কখন হুট করে চলে আসে। ব্রিজলাল সেদিন চলে এলো। ব্রিজলাল নতুন টেণ্ডার পেয়েছে রাস্তায় স্টোনচিপস দেবার। এখনো কাজ শুরু হয়নি, তবু ব্রিজলালকে পেয়ে অফিসের সবাই হৈ-হৈ করে বললো —ব্রিজলালজী চা খাওয়ান। আরে খায়েন খায়েন। আর কুছু হবে? —এখানকার বাজারে দারুন তেলেভাজা করে। —ও ফণী। বড়বাবু ফণীকে ডাকে।

বংশীরও কোনো কাজ নেই। এখন ওস্তাদ দুপুরবেলায় খেয়ে-দেয়ে কোথায় যে বেরিয়ে যায়, ফেরে সন্ধ্যের পরে চুর হ'য়ে। এসে

নেশা নেমে গেলে আবার ব্লাডার ভেঙে আনতে হয়, বংশীর ওস্তাদের এ চেহারা ভালো লাগে না, কবে যে বর্ষাটা থামবে। ওস্তাদ আবার কাজ করুক, আবার রোলার চলুক। বংশী একথা কাউকে বলতে পারে না, কাকেই বা বলবে। বংশী অফিসে বসে ছিল, বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। ঝির-ঝির ঝির ঝির, তেলেভাজা আর চায়ের ব্যাপার ঠিক হ'ল। বড়বাবু আবার ডাকলেন—ও ফণী আমার ছাতাটা নিয়ে একবার এগোও না। ফণী একটু বিরক্ত হ'য়ে বলে আপনাগো মাঝে মাঝে যে কি শখ জাগে, এইডাকি বাইরনের সময় হইলো ? ছ্যান ছ্যান, দেহি পাওয়া যাইবোকি যাইবো না। বংশীও ওদের সঙ্গে মজা করছিলো। এই সময় তিন থেকে চার মাইলের নতুন কেরাণী ছোকরা বীরেন বল, জানলার কাছে দাঁড়িয়ে ঘাটের দিকে তাকিয়ে বলে—আশুদা, তুমি কি ঘর পেয়েছো গো মাইরী কি কি সব জিনিস! এ নাহলে কাজে এনথু জাগে? জানলার শিকটা প্রায় গালে ডেবে যায় বীরেনের গায়ে হুড়মুড়িয়ে, মুখের পাশাপাশি আরো কয়েকটা মুখ এসে জড়ো হয়। বড়বাবু চেয়ারের উপর দাঁড়িয়ে চশমার ফ্রেমের তলা দিয়ে চোখ রেখে বলে—এ্যাই বীরেন, আস্তে আস্তে অফিসে ডিসিপ্লিন বলে একটা কথা আছে। সাহেব ঘরে আছেন। আরে রাখো তোমার সাহেব। বীরেন বলে—মাইরী তোমার ঘরে অনেক স্পেস, আমার টেবিলটা আমি এ ঘরে নিয়ে আসবো এই বলে দিলুম। বংশী দাঁতে দাঁত ঘষে, কিছু করার নেই, ওরা অফিসের বাবু। খালি মনে মনে ভাবে চাঁপাদিকে এ সময় ঘাটে আসতে বারণ করবে। তাছাড়া এ সময় তো চাঁপাদি ঘাটে আসেও না। হয়তো দরকার পড়েছে। তা না হলে এখন কেউ আসে, শালা শুয়োরের বাচ্চা সব, এদের বাড়ীতে কি মা বোন নেই? বংশী রাগে ফুঁসতে থাকে। ঘেন্না হয় ওদের চা তেলেভাজা মুখে দিতে। ঘর থেকে ও নিঃশব্দে বেরিয়ে আসে। তখনো বীরেনের গলার আওয়াজ শোনা যায় হাওয়ায় মেরা দিল্, আ গলে লাগ্ যা আ-আ।

অফিস থেকে বেরিয়ে এসে বংশীর আরেক সমস্যা হোলো ও এখন কোথায় যায়? বংশী ভাবলো একটু শুয়ে থাকা যাক। কিন্তু দুপুরে

এমনিতেই ঘুম আসে না তার ওপর এই অবেলায় ঘুমনোর কথা ভাবা যায় না। বাইরে টিপ টিপ বৃষ্টি, ওস্তাদ নেই, থাকলে হয়তো সময়টা কেটে যেতো। বৃষ্টি এলে বংশীর বড়ো কান্না পায়, বড্ডো একা, এক থাকলেই রাজোর ভাবনা মাথায় ঘুণপোকা হ'য়ে চেপে বসে। নিজের মাকে তো মনেই পড়ে না। বাবা তো নয়ই শুধু ছোট বোনটা। অথচ সন্ধ্যা নিজের বোন নয় সৎ-ই। তবু কেন যে দাদা দাদা বলে এত আদর করে। কেন সে একলা থাকলে ওর কথা মনে পড়ে। কেন যে চিঠি এলে এক চিঠি বারবার করে পড়ে। কেন ওর নামে বংশী পোষ্টঅফিসে টাকা জমায়, জানে না, কেন বংশীর নিজের জন্যে তো এমন করে কখনো মনে হয়নি। ভালো লাগাটাগার আজব ব্যাপারগুলো মাঝে মাঝে বংশীকে এমন করে দেয়। বংশী খাটিয়ায় শুয়ে পড়ে বাইরের আকাশ দেখে। নাঃ। শুয়ে থাকলে চলবে না। সংসারের কয়েকটা জিনিস মোড়ের লালার দোকান থেকে কিনে আনতে হবে। আলু পেঁয়াজ দুটোই ফুরিয়ে গেছে। আকাশটা বোধ হয় একটু ধরলো। দেয়ালের পেরেকে ঝোলানো চটের ব্যাগটা হাতে করে বেরিয়ে পড়ে।

মোড়ে টিউবওয়েলের ধারে একটাই মুদীর দোকান মানে কেরোসিন তেল, চুলের কাঁটা ষ্টোভের পলতে থেকে শুরু করে চাল, ডাল, তেল, নুন, পেঁয়াজ, আদা, পোস্ত সব কিছু সাজানো আছে। ভাগ ভাগ করে সাজানো ঝোলনো আছে চাটনি। আছে ওপরের তারে লটারী থেকে একটা পাত্তা, সাবানের বিজ্ঞাপন যা এককালে এনেছিল লালাজী, এখন ধুলো পড়তে পড়তে নামধাম বোঝা যায় না। দোকানটাতে মিল ফেরতা মানুষ থেকে শুরু করে আশেপাশের মানুষজন পড়শীরা আসে। যেন মরুভূমিতে দোকানটা জলাধারের মতো। লালাজী এখানে কবে এসেছিল, কেন এসেছিল তা কেউ জানে না। তবে শোনা যায়— ওর এক দেশওয়ালী ভাইয়ের মিলের ভেতরে তৈরী রুটি আর কুমড়োর ছক্কা খেয়ে সেই যে আমাশা হয়ে গিয়েছিল আর সারেনি তাই এখানে একটা ছাতু চাটনি আর থালা নিয়ে বসলে বেশ লাভ হ'য়ে যাবে দেখে এই লালাকে দেশ থেকে জরুরী খত্ লিখে এই ভাই

আনিয়েছিল। লালাজী ছাতুর ধামা চাটনি থালা নিয়ে শুরু করেছিল বটে তবে আশপাশের লোকজনের চাল ডাল তেলের ব্যাপারটাও এড়ায়নি! ফলে ছাতুর লাভের সঙ্গে ছোট্ট এই একটা দোকান হোলো।

দোকান বাড়তে বাড়তে লাগোয়া পেছনের জলাজায়গায় মাটি ফেলে ঘর হ'ল। ঘর বড় হোলো। দেশ থেকে গরু আর জরু এনে একসঙ্গে ভঁইসের তুধের ব্যবসা চললো। তারপর ভাই ভাতিজা নিয়ে এনে একসময় গোটা বাড়িটাই কিনে ফেলল লালাজী। তবে লালাজী তার সিদ্ধিদাতা ছাতুকে ভোলেনি। এখনো পাশে সেই পুরনো ছাতুর চৌকি আছে। এখন আর খদ্দেরদের রাস্তায় বসে খেতে হয় না, দোকানের পেছনের মেঝেতে মাতুর পেতে দেওয়া হয়েছে। লালাজীর ছেলেই এখন দাঁড়িপাল্লায় মেপে থালায় মাঝখানে দিয়ে দেয়। লালাজীর বউ-এর চটুল চাহুনির প্রশংসা এখন মিলের অনেকেই করে। লালাজীর দোকানের ধারের যত দোকান, লালাজীর টাকার সঙ্গে বেড়েছে বিশাল ভুঁড়ি! ঠায় ব'সে থাকা। যত ইচ্ছে মাল নাও কিন্তু হপ্তায় মিল পেমেণ্টের সময় দিয়ে দিতে হবে। হ্যাঁ, আবার নাও। বড়জোর মাস পর্যন্ত টেনেটুনে সময় দিতে পারে লালাজী, কিন্তু তার বেশী নয়। মুটে মজুর বাঁধা গৃহস্থ সবাইকে এভাবে লালাজী বাঁচিয়ে রেখেছে দাদন দিয়ে। লম্বা খেরো খাতাটাতে দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করে রাত্রে কান থেকে পেন্সিল উঠিয়ে বারবার মন দিয়ে লালাজী লেখে হিন্দিতে। লালাজী হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেলে এখানকার প্রায় হাঁড়ি বন্ধ্। তা না হলে? যাও, নগদ পয়সা নিয়ে ছুটতে হবে সেই মিল লাগোয়া বাস স্ট্যাণ্ডের বাজারে। লালাজী সেটা জানে, আর জানে বলেই বড়বাজারের ঝড়তি পড়তি ধূলো পাইল মালগুলো এনে এখানে ধারে বেচে। দাম নেয় বাজার ছাড়া-পড়তা, পোষায় নেবে না হলে নিও না। বংশী এর জন্যেই লালাজীর ওপরে চটে যায়। কি দরকার বাবা, নগদ পয়সা দেবো, হাট থেকে দেখে শুনে মাল তুলে নেবো। তুটো বুড়ো আঙ্গুল আপন মনে অদৃশ্য লালাজীকে দেখিয়ে বলে—আমার এই কলা—তোর মাল তুই বুদ্ধুদের বিক্রি কর্

ওসব আমরা বুঝি। কিন্তু উপায় নেই এখানকার মানুষদের। যেমন আজকে বংশীরও যা অবস্থা। এখন কে আর অদ্দূর যায়? চাঁপাদিকে বংশী বলে—এসব রাবিশ মাল নাও কেন? হাট থেকে কিনতে পারো না? শালা জিনিষেও মারবে, ওজনেও কম দেবে। চাঁপাদি হাসে। হাসতে হাসতেই বলে—তা কি জানি না, বংশী, কিন্তু হাটে কি আমাকে ধারে জিনিষ দেবে? মাস মাস বাকী দেবে? তাছাড়া জিনিসপত্র হুটহাট কম পড়ে গেলে এক দৌড়ে হাট থেকে কিনে নিয়ে আসতে পারবো? হাট কি রোজ বসে? ধারে পাওয়া যায়? তাই লালাজীর কাছে কেউ এমনি এমনি যায় না। লালাজী ময়াল সাপের মতো সবাইকে টেনে এনে গিলে ফেলে। যাদের রোজ হাঁড়ি চড়ে না তাদের অত বাছ বিচার করলে চলে?

—সত্যি তোমার বাবাটা যেন কি, মানুষ এমন হয়ে যায়? কেন তোমরা সবাই বাবার মিলে গিয়ে দাঁড়াতে পারো না? যাতে হপ্তাটা তোমাদের হাতে চলে আসে? আমাদের হেড অফিসের একজন দপ্তরী ঠিক এইরকম ছিল। সংসার দেখতো না, ছেলেমেয়েরা খেতে পেতো না। মাইনের দিন এলে গেটে কাবলীঅলা দাঁড়িয়ে থাকতো। শেষপর্যন্ত বৌ ছেলে-মেয়েরা একদিন হাত ধরে অফিসে চলে এসেছিল। অফিসের লোকেরা মাইনের দিন বৌ-এর হাতে পুরো মাইনের অর্দ্ধেক, আর বাকিটা ধার শোধ করে ওর হাতে কিছু দিত। জানো, চাঁপাদি লোকটা তারপর সত্যি সত্যিই ভালো হয়ে গেল। চাঁপাদি হাসে—আমরা এরকম করলে আমার বাবা মহাশয় কি করবে জানো? সে দৃশ্য তুমিও কখনো ভাবতেও পারবে না। বাড়িতে আসবে, জিনিসপত্র সব তছনছ ক'রে মাকে মেরে-ধরে আর হয়তো কোন দিনই কাজে না গিয়ে উধাও হয়ে যাবে। একবার তো তাই-ই হয়েছিল। তার চেয়ে যেমন চলছে চলুক। একটা কথা বলি, বংশী, জীবনে কখনও এরকম বাবা হোয়ো না। অন্ধকার। বংশী, সামনে, পেছনে। মাঝখানে লম্ফ জ্বালিয়ে আমরা দ্বীপের মধ্যে গা জড়াজড়ি ক'রে বসে আছি। কখন যে দমকা হাওয়ায় নিভে যাবো, জানি না। সুখ নয় সম্পদ নয়, গাড়ি, বাড়ি, টাকা নয়, বংশী শুধু বাঁচতে চাই, শিং মাগুরের মতো জীইয়ে থাকতে চাই, তাও বুঝি ভগবান হতে দেবে না।

এ সময়ে ঘর থেকে পায়ে পায়ে নন্দু বেরিয়ে এল। অসুখের পর নন্দু খুব রোগা হয়ে গেছে। ওকে এখন ভীষণ সামলে রাখতে হয়। নন্দুর হাত ধরে চাঁপাদি আস্তে করে ওকে কোলে বসিয়ে নিয়ে ওর চুলে বিলি কাটতে কাটতে বলে—এরা এসব বোঝে না, বোঝার বয়সও হয়নি। শুধু ভাবি, ওরা কবে বড় হয়ে উঠবে। হ্যাঁরে নন্দু বলতো, তোরা কবে বড় হয়ে উঠবি ?

নন্দুর এখন কত যত্ন নেওয়া দরকার। অসুখ যখন ছিল, তার চেয়ে এখন আরো বেশী পথ্যি। এই চেহারায় ও যদি আবার পাল্টে পড়ে, তাহলে ভগবানেরও সাধ্যি নাই, যে ওকে বাঁচায়, ডাক্তার কি বলেছে তো জানোই—এত শক্ত অসুখের পর ওর যদি আবার পেটের গোলমাল শুরু হয়, তাহলে আর উপায় নেই। অথচ ওকে আমরা এখন কি খাওয়াতে পারছি ? অন্ততঃ বাবার যদি এদের দেখেও একটু মায়া হতো। চাঁপাদি একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলে—আমি একা আর কদ্দিক সামলাই বলো ? আর অসুখ থেকে উঠে ছেলেটারও যে কি খাবার দিশা হয়েছে, রাতদিন শুধু খাই-খাই আর খাই-খাই। জানো বংশী, ম্লান হেসে চাঁপাদি বলে—গরীবের বড্ডো খিদে, তাই না ?

—বাঃ, তুমি তো বেশ বললে হে, খিদে পেলে খেতে চাইবে না ? তাছাড়া ও টাইফয়েডের রুগী, এ সময়তো একটু খিদে পাবেই। বংশী বেশ নাবালকের মতো কথাগুলো বলে যায়। চাঁপাদি বলে—তা ঠিক, তবে কি জানো গরীবদের অত খিদে পেতে নেই। চাঁপাদি উঠে এবার একটু তীর্যক হেসে বলে—নন্দু, তোমাদের বংশী মামা যখন বলেছেন তখন তোমার ভাতটা এক্ষুনি চাপিয়ে দিতে হয়, তাই না ? আর মরণ হয়েছে কি জানো, নন্দুর অসুখ, তা ওর জন্যে যে আলাদা করে দু'বেলা একটু ভাত আর মাছের ঝোল করব, তারও উপায় নেই, ছোট ছোট ভাইবোনরা কি আর অতশত বোঝে, ওরাও খাবার সময় বায়না ধরে, ঝামেলা করে, ওদের না দিয়ে নন্দুকে কি একা দেয়া যায় ? আমি যে কি করি। আমি যেন আর পায়ের তলার মাটি খুঁজে পাচ্ছি না। বংশী আমি সত্যি সত্যিই বুঝি এবার হেরে যাবো।

রাতে ওস্তাদ ওপাশের খাটিয়া থেকে গর্জন করে ওঠে—কি রে শালে, রূপেয়া কি সব হাফিজ হয়ে গেল? হুঁম? ফোকটকা মাল দরিয়ামে ঢাল? রূপেয়া জলদি আপোস করবি। সাফ বাত বলে দিচ্ছি।

বংশী আলতো গলায় বলে—চাঁপাদি তো বলেছে দিয়ে দেবে।

—ছোড়্ ছোড়্, ওতো ডেইলি কা বাত। শুনতে শুনতে তিন মাহিনা হাওয়া হোয়ে গেল।

রাতে ওস্তাদ অন্য লোক। মানুষকে মানুষ বলে মনে করে না। এই একটা মানুষ, দিনে এক, রাতে আর এক। আরেক খিদে এখন সারা সমাজ, মানুষকে থাবায় পুরে ফেলতে চায়। রাতের কথা মাঝে মাঝে পরে শোনালে ওস্তাদ লজ্জা পায়, তাই বংশী রাতে ওস্তাদ-এর সঙ্গে খুব একটা কথা বলে না, কিন্তু একটা জ্বালা বোঝে, কোন রকমে শুইয়ে দিতে পারলে যেন ও বাঁচে। রাতের পশুটা ঘুমিয়ে না পড়লে সকালের ওস্তাদ জাগবে না। ওস্তাদ থামেনা, বংশী আলতো গলায় উত্তর দেয়—দেখো, ওর বাবা মাইনে পেলেই তোমার পাওনা ঠিক শোধ করে দেবে।

—চোপ্ শালা। দেখ, বংশী সাফ বলছি—রূপেয়া এ হপ্তা মে জরুর আপোস চাই, ইয়াদ রাখবি।

—ওস্তাদ, বংশী ধরা গলায় বলে—এ্যাতো টাকা তোমার। খরচ-খরচা নেই, তোমার ব্যাঙ্কেও জমছে। ভগবানতো তোমাকে মারেনি ওস্তাদ, তোমার এক্ষুণি এত টাকার দরকার হবে? কেন কেউ তোমার কাছ থেকে বিপদে ধার নিয়েছে বলে?

কি হোবে না হোবে, ও বাত ছোড়্, রূপেয়া আপোস লিয়েআসবি। শালা, জানানার পিছু পড়েছিস। —ওস্তাদ। বংশী এবার আরো জোর গলায় বলে—থামো ওস্তাদ আমি কালই চাঁপাদিকে বলবো। —হাঁ হাঁ বলবি, বলবি।

না, এবার চাঁপাদিকে ব'লে যেমনি করেই হোক ওস্তাদের টাকার

ব্যবস্থা করতেই হবে। কিন্তু আকাশ-পাতাল ভেবে বংশী খেই পায় না। কি করবে চাঁপাদি, বংশীরও তো আর টাকা নেই তাহলে ?' যাই হোক চাঁপাদিকে বলতে হবে। কোথায় বলবে ? শালার বাবা কে ? ইচ্ছে হয় এক ঘুঁষিতে তোমার থোবনা ভেঙ্গে দিই। একবার যদি ঘাড় ধ'রে ওস্তাদের কাছে তোকে নিয়ে যেতে পারতাম। বংশী অবশ্য বকে, পরে ভাবে, কি আর হ'তো, বংশী যে চাঁপাদির বাবার মুখোমুখি হয়নি, তাতো নয়, কিন্তু কিইবা করতে পেরেছে। বংশী কতটুকুই বা করতে পারে।

তবু বংশী বিকেলে কথাটা একবার ছুঁইয়ে দিতে এলো। চাঁপাদি নেই, মাসীমা নন্দুকে পাশে বসিয়ে ছোট মেয়ে মীনাকে কোলে নিয়ে গল্প করছে। নন্দুর সেই এক নাকি কান্না—খিদে পেয়েছে. মাসীমা বোঝাচ্ছে—এক্ষুনি দিদি দোকান থেকে এসে পড়বে বাবা। দিদি এলে গরম ভাত, ডাল আলুভাতে দিয়ে দিদি খাইয়ে দেবে। নন্দু যেন এ মুহূর্তেই ভাতের গন্ধ নাকে পেয়ে যায়। একটু চুপ করে থাকে। মাসীমাকে আরো বেশী রোগা মনে হচ্ছে। বংশীকে দেখে মাসীমা বলে—কেন যে চাঁপার এত দেরী হচ্ছে কে জানে। মেয়েটা সেই যে কখন গেছে। অবশ্য অনেক জিনিষপত্তর আনতে হবে তো. মাসের শেষ, সংসারে কিচ্ছু নেই। মেয়েটার ওপরে যে কি ধকল যাচ্ছে তা ভগবানই জানে। ও আমার একদিকে ছেলে আর একদিকে মেয়ে। সংসারের পুরো জোয়ালটাই ওর কাঁধে। আমি তো রুগী, কবে যে ডাক আসবে। সন্ধ্যেয় মাসীমা ঠাকুরকে ডাকে।

সন্ধ্যে নেমে এলো। ওস্তাদ এসে পড়বে। বংশী উঠবো কি উঠবো না ভাবছে। এমন সময় চাঁপাদি ঢুকলো অগোছাল, উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠোনের ও পাশ দিয়ে প্রায় চীৎকার করে ডাকলো—মা-আ-আ। চাঁপার চেহারা আর গলার আওয়াজ শুনে মিনুকে কোল থেকে সরিয়ে মাসীমা দাওয়া থেকে নেমে ভয়ে ভয়ে বললো—কি হয়েছে ? কি হয়েছে রে চাঁপা ? তোর একি চেহারা হয়েছে ! —থাক্ থাক্, চীৎকার করে মাঝপথে কথাটা থামিয়ে দিয়ে চাঁপাদি বলে—থাক্ তোমাকে আর আমার চেহারা দেখতে হবে না। মা, তোমাদের লজ্জা করে

না। যদি খেতে দিতে না পারবে, তবে, আমাদের পৃথিবীতে আনলে কেন? জন্মো দিলে কেন? তোমরা মানুষ, না, জানোয়ার? বলতে পারো, বলতে পারো তোমরা কি? বলতে বলতে হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠে চাঁপাদি। অসুস্থ মাসীমা কিছুই বুঝতে পারে না। শুধু হলদে চোখ দুটো আরো ঘোলাটে হয়ে যায়, সাদা কাগজের মতো মুখে তাকিয়ে থাকে। উত্তেজনায় বুক থেকে কাপড়টা পর্যন্ত উঠোনে গড়িয়ে পড়ে চাঁপাদির। চাঁপাদি কিছুই বলতে পারে না। কান্নার শরীর নিয়ে দাওয়ায় বসে পড়ে। নন্দু ক্ষিদের কথা ভুলে গেছে। ভাইবোনেরা তটস্থ হয়ে মাকে জড়িয়ে ধরে। শুধু মাসীমা আলতো গলায় বলে—তোকে কে সব্বোনাশ করলো বল্? এবার চাঁপাদি মুখ থেকে হাত নামিয়ে ফুঁসে ওঠে—সব্বোনাশ, সব্বোনাশ কিছু হলে হয়তো এর চেয়ে অনেক ভালো ছিল মা, অপমানটা এভাবে গায়ে এসে লাগতো না। এই অপমানটা যেন সারা শরীরে বিচুটির ঘষা দিয়ে দিয়েছে। মা আমি আর পারছি না, আমি সইতে পারছি না। মাসীমা কাঁপা গলায় বলে—কি হয়েছে একটু বল চাঁপা। মাসীমার কথাগুলো আর্তমাদের মতো শোনায়। —মা, লালার দোকানের টাকাটা পর্যন্ত বাবা দু মাস দেয়নি, দুশো টাকার ওপরে। সেইবা ছাড়বে কেন? সমস্ত জিনিস ওজন করে ব্যাগে ঢুকিয়ে আনতে যাচ্ছি, সে সময় হাত থেকে ব্যাগ কেড়ে রেখে দিয়ে বললো—তোর বাবাকে পাঠিয়ে দিবি, পয়সা নেই, ধার শোধের নাম নেই, খেতে লজ্জা করে না? নগদ দিয়ে মাল নিয়ে যাবি। বাবাকে চোর ছ্যাঁচোড় বলে যা-তা গালাগালি দিল, আর আমার হাত থেকে ব্যাগটা টেনে নিয়ে রেখে দিল। ছিঃ ছিঃ, এতগুলো লোকের সামনে এমন অপমান। কাল সকালে আমি মুখ দেখাবো কি করে? বলে এসেছি লালাজী যেখানে ব্যাগ আছে, সেখানে থাক, ছোঁবে না। তোমার মুখে আমি টাকা ছুঁড়ে দিয়ে ব্যাগ নিয়ে যাবো। বলো, এ অপমান সহ্য করা যায়? চাঁপাদি ডুকরে কেঁদে ওঠে। এবার চোখ পড়ে বংশীর দিকে। বংশীর দিকে তাকিয়ে চাঁপা এক মুহূর্ত কি যেন ভাবলো। তারপর চোখের পলক না ফেলে নিজেকে গোছগাছ করে নিয়ে বলল—তোমার সঙ্গে কথা আছে

বংশী। মা ঠাণ্ডা লেগে যাবে, ওদের নিয়ে ঘরে যাও। মাসীমা ঘরে গিয়ে আলোটা জ্বালাতেই অন্ধকারগুলো লাফিয়ে পড়লো উঠোনে।

অন্ধকারের মুখোমুখি চাঁপা আর বংশী দাঁড়িয়ে।

—বংশী ?

ঃ বলো।

—তোমার ওস্তাদ কখন ঘরে থাকে ?

ঃ রাতে ওস্তাদ ভেট করে না।

—নাঃ তুমি নয়। বংশী আজ রাতে তোমার ওস্তাদের কাছে আমি নিজে গিয়ে টাকা ধার চাইতে যাবো।

ঃ অন্ধকার ছিঁড়ে-খুঁড়ে বংশী কান্নার স্বরে চেঁচিয়ে বলে—নাআঃ। তুমি জানো না চাঁপাদি, ওস্তাদ রাতে কত ভয়ঙ্কর হতে পারে। কিন্তু তোমাকেতো আর তোমার ওস্তাদের কাছে আর পাঠাবার মুখ নেই। কার ওপর নির্ভর করে পাঠাবো ? এতো ঠকানো। আমি জেনে-শুনে কোনো মানুষকে ঠকাতে পারি না। ও টাকা বাবা কখনই তোমার ওস্তাদকে ফিরিয়ে দিতে পারবেনা, ভেবেছিলাম হয়তো হবে, এখন আর তা মনে হয় না। মনে হয়, বাবাকে দেখিয়ে তোমার ওস্তাদের কাছে টাকা চাওয়া মানে বঞ্চনা করা, ঠকানো। কাউকে ঠকিয়ে আমি টাকা নিতে চাই না বংশী। আমায় যেতে হবে। যেতে আমাকে হবেই। বংশী, সামনে দাঁড়িয়ে আমি চাইলে তোমার ওস্তাদের বেশ কিছু টাকা ধার পাবো না ? নন্দুকে মাকে ভাইবোনদের আমাকে তো বাঁচাতে হবে বংশী। সংসারে একজনকেতো বলি হ'তে হয়।

বংশী চিৎকার করে বলে—নাঃ, না। নাঃ চাঁপাদি, কক্ষনোন্না। আমি পারব না, তুমি যাও। তুমি জাহান্নামে যাও চাঁপাদি। আমি তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারব না। তোমার দুটো পায়ে পড়ি চাঁপাদি। রাতে ওস্তাদের কাছে তুমি যেওনা।

নির্বিকার চাঁপাদি বলে—বংশী আজ রাতে তোমার ওস্তাদের

সঙ্গে দেখা করতে হবে। নিঃসাড় মৃত মানুষের মতো ফ্যাসা গলার আওয়াজ শোনা যায়। আমাকে যেতেই হবে বংশী, আমাদের বাঁচতে হবে।

রাত হ'য়ে গেছে। কত রাত বোঝা যায় না। বংশী দাওয়ার খুঁটিতে হেলান দিয়ে কতক্ষণ বসেছিল তাও জানে না। কখন চাঁপাদির সঙ্গে ও এসেছে, জানে না। নিশির ডাকের মতো চাঁপাদির সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার পথ মাড়িয়ে আসছে বংশী। রাত বোঝা যাচ্ছে না। দূরে মুখ ঢাকা চোলাই-এর কলসী-ঘেরা ভিড় কখন সরে গেছে। নির্জন পথে শুধু ঝিঁঝির শব্দ, ভুতুড়ে আওয়াজের মত বেজেই চলেছে। ধারের অ্যাশশ্যাওড়ার গাছ মুড়ে রয়েছে জোনাকির ঝাড়। গোটা গাছটাই ঝিরঝিরে টুনি বালবের হাল্কা আলোয় ভরে গিয়ে অন্ধকারের পথটাকে চিনিয়ে দিচ্ছে, সমস্ত পাতার ফাঁক ফোকরে কে যেন আলগোছে যত্ন করে একটা একটা জোনাকির আলো বসিয়ে দিয়েছে। আকাশে অন্ধকার জমিনের ওপর জরির বুটির মত ফুটে আছে অসংখ্য চুমকি। অন্ধকার আকাশের জ্বলজ্বলে তারার গা থেকে লক্ষ আলো ঠিকরে পড়ছে পথে। এ আলোতে লোক চেনা যায় না, অনুভব করা যায়। দূরে ধূসর ধূ-ধূ বালির প্রান্তরটা যেন ঠিক এক সমুদ্রের মত। অনেক দূরের জোনাকির আলো ফসফরাস হয়ে জ্বলছে, চোখ মুখ অশরীরী একটা ভূতগ্রস্ত মাতাল ছায়া বংশীর পেছনে হেঁটে চলছে। দু'জনের কারও মুখে কোন কথা নেই। অন্ধকারে কারও মুখ, চোখ, ভুরু, কিছুই চোখে পড়ে না। শুধু পাতার খস খস শব্দ। দরজা খোলাই ছিল। অন্ধকারে বংশী দরজায় ঢুকে ডাকল—ওস্তাদ।

দাঁতে দাঁতে কথা চিবিয়ে বচন বলে ওঠে—শালা হারামী। বংশী কোন কথা বলে না। আস্তে আস্তে স্পষ্ট করে শব্দগুলো উচ্চারণ করে—ওস্তাদ টাকা চাই। আরো টাকা। আরো, আরো অনেক টাকা। দিতে পারবে ওস্তাদ? বংশীর চোখে জল, অন্ধকারে ওস্তাদের কি চোখে পড়ল? বচন উঠে দাঁড়াল। অভুক্ত বচন, বংশীর দিকে হিংস্র—এগোয়। বংশী দাঁড়িয়ে আছে যেন কাঠের পুতুল, বংশীর দিকে

এগোতে গিয়ে বচন হঠাৎ ঘাড়ের পাশ দিয়ে দূরে ছায়া-মূর্তি দেখতে পায়। গরগরিয়ে ডাকে বচন —কোউন, উধার কৌন বে? অন্ধকারে দুটো চোখ বাঘের মত জ্বলে ওঠে।

—কৌউন বে?

ঃ চাঁপাদি ওস্তাদ।

বচন বংশীর দিকে এগিয়ে এসে দুকাঁধে বাঘের থাবার মত নখগুলো চেপে ধ'রে বলে কি বললি? চাঁপাদি? বংশীর কাঁধ দু'খানা থেকে যেন দুটো হাড় এক্ষুণি বেরিয়ে আসবে। বংশী টাল সামলাতে পারে না। বসে পড়ে। ঠোঁটের কোণে হাসি নিয়ে বচন বলে—আরে মেহমান, বাহার? বচন টলছে। বংশী, উনকো অন্দর বোলাও। আইয়ে, তসবীর রাখিয়ে। বচন দরজার ওপরে ধাক্কা খেয়ে পড়ে যায়।—ও-স্তাদ, চিৎকার করে ওঠে বংশী। দাঁড়িয়ে ওঠে। —আরে শালে, তু, ড্রাইভার বন্‌বি না? ওস্তাদের চোখে মুখে কঠিন হাসি। অন্ধকারে বংশী চেঁচিয়ে আর্তনাদ করে—না-আঃ।

ঃ লাইসিন লিবি না?

—ন্না।

ঃ তিন মাইলের নয়া রোলার চালাবি না। বচন টলছে। আব্বে বংশী রোলার ড্রাইভার!!

না-আঃ। ওস্তাদ, আমার কিচ্ছু চাই না। ফুঁপিয়ে ওঠে বংশী। তুমি আমাকে ধার দাও ওস্তাদ, আমি তোমায় শোধ দিয়ে দেবো।— শাল্লা, বেইমান, কুত্তা, নিমকহারাম। আর বলতে হয় না অশরীরী আত্মাটা চাঁপাদি হয়ে ঘরে ঢোকে। নির্বিকার শান্ত। স্থির দুটো চোখে এবার বংশীর দিকে তাকিয়ে চাঁপা বলে—তুমি বাইরে যাও বংশী। তোমার ওস্তাদের সঙ্গে আমার লেন-দেনের কথা আছে। আমার যে এখন অনেক, অনেক টাকার দরকার। —তুমি বাইরে যাও, শব্দটা আরো জোরে বংশীর কানে আসার সঙ্গে সঙ্গেই বচনের থুথু বংশীর গায়ে এসে লাগে।

—থুঃ। নিমকহারাম, নিকালো ইঁহাসে কুত্তা।

—যাও বংশী।

—আভি নিকালো শালা।

বংশী যেন ছিটকে পড়ে দরজার বাইরে। দরজাটা বন্ধ হয়ে যায়। বংশী কাতরায়। দরজাটার পাল্লায় মাথা ঠোকে আর ওস্তাদের ভারী নিঃশ্বাস, যেন বংশীর বুকে ধোপাদের পাটাতনে কাপড় আছড়াবার আওয়াজ—ইশিউপ্ ইশিউপ···বংশীর চামড়া রক্তাক্ত হয়ে যায়। বংশী টাল সামলাতে পারে না। ওপারের কামিনী গাছটার ডালে হাত রাখে। বর্ষার কামিনী—রাতের সাদা পোশাক প'ড়ে ফুটে আছে। হাতের চাপে ছোট ডালটা ভেঙে যায়। বংশী প্রাণপণে পাতা ফুলগুলো নৃশংসভাবে ছিঁড়ে-খুরে টুকরো টুকরো করে দেয় প্রবল এক যন্ত্রণায়। তলার মাটি বংশীর পায়ের চাপে আলগা হয়ে যায়। দুটো আঙুল গেঁথে যায় মাটির ভেতর। তারপর বংশী কামিনী গাছটাকে জড়িয়ে এই প্রথম ছেলেমানুষের মত ডুকরে কেঁদে ওঠে। কাঁদে, মুখ, আর গলা ঘষে গাছটার গায়ে।

পায়ে পায়ে চাঁপাদি এক সময় বেরিয়ে আসে। শব্দহীন। বংশীর পিঠে হাত রেখে ডাকে—বংশী।

বংশী ফুলে ওঠে। ফিরে তাকায়। চাঁপাদির চোখে জল নেই, রাগ নেই, ক্রোধ নেই। তবু বংশী তাকাতে পারে না। একরাশি ঘৃণা চোখে নিয়ে পিঠ ছাড়িয়ে হাঁটতে থাকে। সামনের দাঁড়িয়ে থাকা রোলারের গায়ে হাত বুলিয়ে দূরের—সমান করা পথে। হাঁটতে থাকে আরো জোরে।

—বংশী···বংশী···। চাঁপাদির গলা দূরের মাঠ ছাড়িয়ে চলে যায় আরো দূরে। —বংশী যেও না, যেও না, শোন। দৌড়তে গিয়ে চাঁপাদির আঁচল লুটিয়ে পড়ে, তবু ছোটে আরো জোরে। দৌড়ে গিয়ে বংশীর জামাটা আঁকড়ে ধ'রে হাঁপাতে হাঁপাতে বলে—বংশী, মন ছাড়া শরীর, একটা মরা মানুষের মত। কি হয়েছে আমার? কিছু হয় নি, ছাখো, চেয়ে ছাখো একটু আমার দিকে। একবার তাকিয়ে ছাখো। ছেঁড়া খোড়া, বিপর্যস্ত ঋজু চাঁপাদি সমস্ত শরীর সোজা চিতিয়ে দেয়।

আমার চেয়ে পবিত্র আর কেউ নেই। আমার বুকের অনেক গোপনে আমার যে মনটা আছে, তাকে? তাকে ছোঁবে কে? চাঁপাদির চোখে জল মুক্তোর দানা হয়ে ভেঙ্গে পড়ে। চাঁপাদি বলে তাতো একজনের জন্যেই তোলা থাকে বংশী। জেনো, তোলা রইলো। তুমি বড় হও। বড়, আরো অনেক বড়।

আমাকে বাঁচতে হবে।

এই জঙ্গলের নতুন পথে আমাদের বাঁচতে হবে।

বিশাল জন্তুর মত দাঁড়িয়ে থাকা রোলারের অন্ধকারের ঘেরাটোপে দু'জনে আলোর শরীর হয়ে মিশে রইলো।

উঠতে উঠতে থেমে থাকা বড় কষ্টকর

চৈতির বিকেল

জলপাই রঙের জাজিমের উপর পোড়া-শহরের ধূসরতা নিয়ে দাঁড়ানো দূরের কানিসের মাথায় শেষ বিকেলের রোদটাকে কে যেন আঁকশি করে টাঙিয়ে দিয়ে গেল। শরৎ-এর রোদের মেজাজই আলাদা। আদালা রঙ, আলাদা রূপ, যেন পূজোর গন্ধ বয়ে আনা আগমনীর মাদল। ঠিকমতো ঠাহর না করলেও এ রঙ চিনতে অসুবিধে হ'য়না। সাততলায় অরুণের নতুন কেনা ফ্ল্যাটের জানালায় ভর দিয়ে একথা ভাবতে ভাবতে চৈতির একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো।

তলায় শুয়োপোকার মতো ঘুরে যাচ্ছে ট্রাম। খানিক দাঁড়িয়ে মানুষ হুসহাস করে চলে যাচ্ছে সরকারী বাস। প্রাইভেট বাসগুলো আওয়াজ তুলে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে পাঞ্জাবী কন্‌ডাকটার। উপরের নির্জন আকাশের তলায় ব্যস্ত কলকাতা দ্রুততর সিনেমা হয়ে এপাশ ওপাশ সরে যাচ্ছে। শুধু নির্জনতা পায়ে পায়ে ভর করে দাঁড়ালো চৈতির শরীরে, শরীর থেকে বুকে, বুক থেকে পিঁপড়ের সারির মতো যন্ত্রণা ছড়িয়ে পড়লো প্রতিটি শিরায়। নির্জনতা কখনো কখনো এত মুখর হয়ে ওঠে?

অথচ এই রোদ, এই বিকেল, বর্ষার মেঘ, একদিন সমস্ত শরীর মন ভিজিয়ে ওদের দু'জনকে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যেতো, সে তো এই চেনা কলকাতাতেই। ভিজে হাঁসের ডানায় আসতো সময়। উপুড় হয়ে থাকা কুমীরের মতো গা সেঁকে অলস দুপুর বেয়ে নেমে আসতো বিকেল, বিকেল গড়িয়ে ওদের চোখের মণিতে বিঁধে থাকতো লোভনীয় সন্ধ্যের আকাশ। অথচ আজো এই দুপুর, এই বিকেল, এই সন্ধ্যে আর এই চৈতি।

দরজায় বেল বাজলো ডিইইং···ডঅঅং। একবার।

চৈতি জানে, ও অরুণ। ওর বেলের শব্দ, জুতোর আওয়াজ, নতুন কেনা অ্যামবাসাডারের হর্ন, সব কিছুই যেন এখন নতুন করে চেনা। সেদিনের এলোমেলো কপালে একরাশ উপচে পড়া চুলের উদ্দাম, উত্তাল ঢেউ-এর মতো অরুণ, আজ কতো বড়ো, কতো দূরের। মানুষ যে কি ক'রে এতো বদলে যায়, নাকি চৈতিই দিনকেদিন যেন কেমন হয়ে যাচ্ছে। কেমন? তা কি ছাই চৈতিই জানে। ক্লান্ত শরীরটাকে জানালার গ্রীল থেকে উঠিয়ে নিয়ে এসে চৈতি আলতো গলায় ডাকলো—মকবুল। তার আগেই সাহেবের চেনা বেলের শব্দ শুনে সর্বক্ষনের বেয়ারা দ্রুত দরজা খুলে সাহেবের হাতে ঝোলানো কোট, হাতের অ্যাটাচি, ফাইল, প্যাকেট, আলগোছে সামনের সোফায় রেখে দিয়ে আবার কাজে চলে গেল। টানটান শরীরে সামনের দিকে সটান পা ছড়িয়ে হেলান দিয়ে বসতে না বসতেই অরুণের পাশের কুশনে নিজেকে গুছিয়ে চৈতি হালকা গলায় বললো—সাহেবের আজ এত তাড়াতাড়ি! অরুণ যেন একটু অবাক হয়েই বললো—বাঃ, তোমাকে সকালেইতো বললুম—যোশীর ফ্ল্যাটে আজ একটা ককটেল আছে।

সেটা আর নতুন কি, ওতো রোজই থাকে।

তুমি যাচ্ছো তো?

না।

সে কি!

প্লিজ, আমার একটুও ভাল লাগে না। কেন জানিনা, আমি কিছুতেই যেন তোমার এই নতুন সোসাইটির সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারছি না। কেন? তুমি তো এখন বেশ মানিয়ে নিয়েছো। সেদিন পার্টিতে চাওলা আন্টি, মিসেস সিং, রীটা ডাট্ তোমার কতো প্রশংসা করছিল। আজকাল তুমি না গেলে ওরা তোমায় মিস করে। জানি অরুণ, তবু ভালো লাগে না, কেন যে লাগে না তা তোমায় ঠিক ঠিক ব'লে বোঝাতে পারবো না।—হরিবল্! জিভ আর ঠোঁটে বিরক্তিসূচক একটা আওয়াজ তুলে হতাশ হয়ে অরুণ বললো—কি যে হয়েছে আজকাল তোমার, রাতদিন মাথামুণ্ডু কি ভাবো বুঝিনা। অথচ তুমি জানো, বিদেশী কোম্পানির একজন সেলস-এক্সিকিউটিভের মাথায়

কতো দায়িত্ব। অফিস থেকে বাইরের পার্টি আলোচনা সবই চাকরী ছাড়িয়ে নয়, প্রতিটি গ্যাদারিংএর সঙ্গেই থাকে ছোট বড় কাজের কথা। এ কাজে হয় প্রমোশন, নয় ডিমোশন একটা লড়াইয়ের নেশা। লিটারারি অর্থে হয়তো কিছু নয় কিন্তু মানসিকভাবে একটা চাপতো থাকেই। তাছাড়া তুমি যে এসব জানো না, তাও নয়, তোমার সঙ্গে এই নিয়ে আমি বহুবার আলোচনা করেছি, অনেক প্রবলেমের কথা বলেছি, জানো চৈতি, উঠতে উঠতে থেমে থাকা বড়ো কষ্টকর। এ এক নেশা, মদ্যপান করার চেয়েও অনেক বেশী।

কিন্তু, অরুণ, সেই সঙ্গে তুমিও কখন যেন একটা চলন্ত ফাইল হয়ে গেছো। তোমাকে এখন আমি ডায়াগ্রাম, কাগজ ব্যস্ততা ছাড়া ছুঁতে পারছি না, অনুভবেও না। তোমাকে জড়িয়ে আছে প্রোজেক্ট। আগে, পেছনে, পাশে, অফিসের বাইরেও আরেক জীবনের ব্যস্ততা। অরুণ, তুমি কোথায়? আমরা সুখ চেয়েছিলাম, কিন্তু কি সুখ। সুখ কথাটার ঠিক মানে আমার জানা নেই। তবু সুখই চেয়েছিলাম, নিজেদের পেরিয়ে নয়, এড়িয়েও নয়। নিজেদের মধ্যে অক্টোপাশের মতো আঁকড়ে থেকে। আজ আমাদের সব হয়েছে, যা চেয়েছিলাম তার চেয়েও হয়তো আরো অনেক বেশী। আরো অনেক উপরে দূর চূড়োর দিকে তুমি এগিয়ে যাচ্ছো। আর অরুণ, আমি ক্রমশঃই নিচু হয়ে হাত বাড়িয়ে দিচ্ছি, ছুঁতে পারছি না, আমরা কেউ কাউকেই আর ছুঁতে পারছি না। তোমার আওয়াজ ঐ দূর গম্বুজের ওপর থেকে বাতাসে মিলিয়ে যাচ্ছে।

ওফ্ চৈতি, তোমার এই ফিল্‌সফিক্যাল কথাবার্তার আমি সত্যিই মানে বুঝি না। মাঝে মাঝে অ্যাততো বোর করে। যাক্‌গে, দ্যাখো তো, এটা তোমার পছন্দ হয় কি না। অরুণ সোফা থেকে উঠে এসে অ্যাটাচির ফাইলপত্রের ভেতর থেকে একটা প্যাকেট টেনে এনে চৈতির কোলে আলুতো রেখে আবার মুখোমুখি বসে কপালের রগ থেকে পাঁচটা আঙুল চুলের মাঝখানে মুঠো করে নিতে নিতে বললো—ওঃ মিস সেনকে লাঞ্চে ম্যানেজ ক'রে কিভাবে যে মার্কেট থেকে কাপড়টা কিনে

এনেছি তা না বললে বিশ্বাস করবে না, তারওপর আমি যা আবার কালার-ব্লাইণ্ড কি আনতে আবার কি এনে ফেলবো, তারপর যদি তোমার পছন্দ না হয় ? তা হলেই গেছি, তবে হ্যাঁ, শাড়িটাড়ী পছন্দের ব্যাপারে মিস্ সেন টপ্। মনে হয় প্রিণ্টটা তোমার খারাপ লাগবে না। যেভাবে অরুণ চৈতির কোলের উপর প্যাকেটটা রেখেছিল, ঠিক সেভাবেই রাখা বস্তুটির ওপর চৈতি সমান্তরালভাবে দুটো হাত রেখে ঠোঁটে একটু হাসি ছুঁইয়ে বললে,—আমাকেই তো নিয়ে যেতে পারতে। পার্কস্ট্রীটের তোমার অফিস থেকে এই ফ্ল্যাটটা আর কতই বা দূর—না না, সে তো পারতুমই আসলে একটা স্টাণ্ট দেবার ইচ্ছে ছিল। তাছাড়া তুমি দেখো, কাপড়টা সত্যিই দারুণ হয়েছে। চৈতি আড়চোখে অরুণের দিকে একবার তাকিয়ে বললো—আফটারঅল রায় সাহেবের পার্সোনাল সেক্রেটারী, তার টেষ্ট কি আর খারাপ হতে পারে?

সত্যিই চৈতি, তুমি অদ্ভুতভাবে পাল্টে যাচ্ছো। চোখের পাতা না নামিয়েই চৈতি বললো—কেন? এইতো হাসছি, ফিরছি, গল্প করছি, ঠিক যেমন করে রোজকার সূর্য ওঠে আবার ডুবে যায়। প্রতিদিনকার এই আমির মধ্যে কোন তফাৎ দেখছো? একটুও? - না, অরুণ মাথা নাড়িয়ে বললো—না, সেরকম কিছুই না, তবে মাঝে মাঝে মনে হয়, আমাদের এই প্রাচুর্য বোধহয় তোমাকে কোথায় যেন ড্যামেজ করছে। আচ্ছা চৈতি, বলো, আমরা কি স্বাচ্ছন্দ্য চাইনি? হয়তো আমি আরো একটু বেশীই চেয়েছি এবং তার মূল্যও আমাকে কম দিতে হয়নি। যে ভয়ঙ্কর দিনগুলো পেরিয়ে যে সিঁড়িতে আজ আমি দাঁড়িয়ে আজকের সে অধিকার আমাকে নিতে হয়েছে লড়াই ক'রে। এ তো সবে শুরু, এখনো সিঁড়ির অনেক ধাপ বাকি। আর এই সময়ে তোমারই সবচেয়ে খুশি হওয়ার কথা, আমার ট্যুর-ফাইলপত্তর, অফিস আর অঢেল ব্যস্ততার মধ্যে তোমার এই বৈরাগ্য, বিষাদ আমায় ভীষণভাবে হতাশ করে। ফ্রাঙ্কলি স্পিকিং চৈতি—আই কান্‌ট টলারেট সাচ্ এ্যাটিচ্যুড মাঝে মাঝে আমার অসহ্য বলে মনে হয়।

চৈতি একটু হালকা গলায় বললো—তবু যা হোক্ অনেকদিন বাদে

তোমার মুখে বেশ কয়েকটা ভালো ভালো বাংলা শব্দ শুনে হঠাৎ কি মনে হ'ল জানো অরুণ। মনে হল তুমি সেই অরুণকুমার রায়, যে কিনা এককালে কবিতা লিখতে ভালবাসতে। আমরা কয়েকজন কনট্রিবিউট ক'রে তোমার একটা বই-বের করবো ভেবেছিলাম। তুমি যেন কি একটা সুন্দর নাম দিয়েছিলে। নামটা আমাদের সবাইয়ের খুব পছন্দ, হয়েছিল। সেই নিঃস্ব অথচ ভরাট দিনগুলো কতো মধুর ছিল অরুণ। আজ বুঝি আমরা সবাই সেই জীবনের প্রথম দিনগুলো বারবার কেন ফিরে পেতে চাই।

যেন হঠাৎ গা-ঝাড়া দিয়ে অরুণ বললো—ওফ, চৈতি একটু চা বলো প্লিজ, বড্ডো টায়ার্ড।—স্যরি অরুণ, সত্যিই আমার মনে ছিল না।—মকবুলল…।

মকবুলের হাত থেকে ট্রে-টা নিয়ে পটে ঢাকা টি কোজীটা আলতো করে তুলে চৈতি চায়ের কাপে জলতরঙ্গের ধ্বনি তুলে বললো আচ্ছা অরুণ, তোমার মনে পড়ে, যখন সময় কাটাবার জন্যে কোনো জায়গা বলতে আমাদের কিছু ছিল না। সে রকম বন্ধু বান্ধবের বাড়ি, তাই বা কোথায়? সারা পৃথিবীর অনন্ত অঢেল জায়গায় এই দু'টো প্রাণীর জন্যে কোনো নির্জনতর একান্ত নিরিবিলি বলতে কিছুই ছিল না।…হাঁটা…হাঁটা…শুধুই হাঁটা, আর হাঁটতে…হাঁটতে…হাঁটতে আমরা পা থেকে বালির মতো ঝেড়ে ফেলতাম দুঃখ। গড়িয়ে পড়তো পড়ন্ত বিকেলের সিঁদুর-গোলা আউটরামের জলে, ময়দানের ঘাসের পাপোষে। আমরা বুক ভ'রে বাতাসের গন্ধ, নিয়েছি, আঁজলা ক'রে তুলে নিয়েছি তৃপ্তির জল। আমরা হেঁটেছি, হেঁটেছে আকাশ আর তুষের মতো তোমার সিগারেট। আজ তোমার নতুন কেনা দুধ রঙের অ্যামবাসাডার হুসহাস ক'রে বেরিয়ে যায়। রেডরোডের বসন্তের কৃষ্ণচূড়া, শিরিষের পাশ দিয়ে। কতো বিকেল যে সন্ধ্যে হয়ে নামে। তোমার মনে পড়ে? মনে পড়ে অরুণ?

—তোমার চা-টা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

কাপটা হাতে নিয়ে মুণ্ডুটা দু'বার এদিক ওদিক ঘুরিয়ে ডান হাতে টাইয়ের ফাঁশটা আলগা করে কাপে চুমুক দিয়ে, স্টেট এক্সপ্রেসের থেকে কায়দা করে একটা সিগ্রেট বের করে গ্যাস-লাইটারটায় টুক ক'রে ধরিয়ে একমুখ তৃপ্তির ধোঁয়া ছেড়ে অরুণ বললো—ছাখো চৈতি, আমার কথাগুলো তুমি কি ভাবে নেবে জানি না, তবু ফ্রাঙ্কলি বলছি—আমার কাছে এখন সেন্টিমেন্ট থেকে জীবন অনেক বড়ো। আর জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে সংগ্রাম, সেটা অতীতকে ভুলে নয়, তাকে আরো সুখকর করে তোলার জন্যে। এখানে আবেগ তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে। বাস্তবের কঠিন আসফল্টে আছড়ে পড়ে স্বপ্ন মায়া মতিভ্রম। আলতো করে চায়ের কাপে একটা চুমুক দিল অরুণ।

অবাক হয় চৈতি, স্মৃতি থেকে কিছু যেন কুড়িয়ে নিয়ে বলে—সত্যি অরুণ, তুমি ঠিকই বলেছো। ফুলের সংসার ভেঙে গেলে কে আর কবে পাঁপড়িকে মনে রাখে। অজস্র পাঁপড়ি আমাদের জীবনে ফুল হয়ে ফুটেছিল আমি তো সেই স্বপ্ন নিয়েই বাঁচতে চেয়েছিলাম অরুণ, গড়তে চেয়েছিলাম আমাদের ফুলের সংসার। অরুণ এবার সোজা হয়ে বসে বললে—বি প্রাকটিকাল চৈতি। একবারও ভেবে দেখেছো আমরা কি দুঃস্বপ্নের জীবন থেকে লাফিয়ে এসেছি। মাষ্টারির মাত্র ক'টা টাকাই যার সম্বল, পকেটে গোনাগুণতি ট্রামের ভাড়া, চা ছাড়া রেষ্টু-রেণ্টের কেবিনে ব'সে অন্য কিছু খাবার কথা আমাদের কখনো মনে আসেনি, চলতি পথের দামী শাড়ি জুতোর শো-কেস থেকে তোমার চোখ ঠিকরে দূরে সবে গেছে, চটির স্ট্র্যাপ ছিঁড়ে যাবার ভয়ে মাসের শেষে পা ঘষটে হেঁটেছি। আজ আমার একটা কথাই মনে হয় চৈতি, স্বাচ্ছন্দ্য ছাড়া ভালবাসা টিকে থাকতে পারে না। আজ যে তোমাকে প্রাণভরে সাজাবার কথা মনে হয়, তুমি যা পাওনি তাই দু'হাতে ভ'রে তুলে দিতে ইচ্ছে হয়, যা কিছু দুর্লভ, তাই-ই তোমার হাতের মুঠোয় এনে দিতে চাই। এবং তার সঙ্গে আমার প্রেম-ও। আমাদের প্রেম ময়ুর হয়ে উঠুক এইতো আমরা চেয়েছিলুম। তাই না?

না, অরুণ, না। অব্যক্ত এক যন্ত্রণায় চৈতি জানালার ধারে সরে এসে চোখ রাখলো। গোধূল-আকাশে।—না অরুণ, এ প্রেম নয়, প্রেম হল আমাদের নতুন কেনা প্রিয় বইয়ের মতো। একটার পর একটা পাতা উল্টে নতুন কিছু পাবার আনন্দ, প্রতিটি পাতায় এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা, আবিষ্কার। আর মেয়েদের অনুভূতি তা তুমি বুঝবে না, তাদের শিরায় শিরায়, শাড়ির ভাঁজের মতো জড়িয়ে থাকে। প্রেম. আলগোছে অতি সন্তর্পণে, তাদের সর্বঅস্তিত্ব নিয়েই। আমি এক একটা করে ইঁট ব'য়ে এনে আমার সেই গোপন মহল বানিয়েছি। এক. দুই, সাত মহল পেরিয়ে তার গোপন কোটরে লুকিয়ে রেখেছিলাম আমাদের ভ্রমর। আমরা বাঁচতে চেয়েছিলাম, মরে নয়। সেই জীবন-কাঠি নিয়ে যেতে চেয়েছি যে কোনো প্রান্তেই হোক। রক্তের মধ্যে আমরা তাকে লালন করেছি, বেড়ে উঠেছে আমাদের বুকের ওমে।

কিন্তু চৈতি। এটা তুমি কেন মানছো না, মানুষ বাঁচার জন্যেই শুধু বেঁচে থাকেনা, সে বাঁচাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্যে তার জীবনকেও বাজি রাখে। যে বীজ বোনা হল, তার শিকড় চারিয়ে দেয় জীবনেরই রস শুষে। তার অস্তিত্ব ডালপালায় ছেয়ে দেয় আকাশ। আমরা তো তাকেই বলি পুরুষকার যার অপর প্রান্ত থেকে রঙিন রুমাল উড়িয়ে দেবে সময়।

কিন্তু অরুণ, আমার ভ্রমর, আমরা যাকে বুকের কোটরে আগলে রেখে দিয়েছিলাম। যার উষ্ণতায় জেগে উঠতো আমাদের ভুবন। যার গায়ে হাত দিয়ে অনুভব করেছি জীবন। যেমন করে অন্তঃসত্ত্বা নারী তার পেটে হাত রেখে অনাগত প্রাণের স্পন্দন অনুভব করে। দ্যাখো—আমার বহমান শিরার মতো নীল যমুনা আজ বিশীর্ণ, ধূসর। আমার নীল পদ্মকোরকগুলো ক্রমশঃই ঢলে পড়ছে। আমার চোখে আহত ভ্রূবিলাস। চৈতির দু'চোখ জলে ভ'রে এলো। আহত পাখির মতো রক্তাক্ত হল যন্ত্রণার শরীর। আমার ভ্রমর কি করে বাঁচবে অরুণ, আমি তো ক্রমশঃ রিক্ত নিঃস্ব হয়ে পড়ছি। আমার একটার পর একটা দরজা ভেঙে ধ্বসে পড়ছে মহল। সন্ধ্যের আকাশ চুঁইয়ে

পড়া বিকেলে চৈতির যন্ত্রণা কুয়াশা হয়ে শহরের বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল।

মকবউউ···ল্। বাত্তি জাল্লা দেও।

অরুণ স্প্রীং খাওয়া পুতুলের মতো সটান সোফা ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। ঘড়ির ডায়ালে চোখ রেখে যেন আর্তনাদ করে উঠলো—ওঃ গড্, চৈতি সাড়েএ-ছ···য়! প্লিজ, একটু তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নাও। মিঃ যোশী, পার্টির ব্যাপারে ভীষণ পাংচুয়াল। হারিআপ চৈতি, প্লিজ্। অরুণ দ্রুত বাথরুমে যাবার জন্যে তৈরী হ'ল।

যখন বৃষ্টি নামলো

সারাদিন মেঘ মেঘ, বৃষ্টি নামে নামে। আকাশে মেঘের-লুকোচুরি করতে করতে শেষপর্যন্ত বৃষ্টিটা ঝেঁপেই এলো। বিকেলেই সন্ধ্যে নামলো ক'লকাতায়, এলোমেলো ঝাপটায় শনশন হাওয়ায় ময়দানটাই ধোঁয়াটে হ'য়ে গেল। লিফট থেকে নেমে অফিস থেকে আমিও বাইরে বেরুতে পারলাম না। ততক্ষণে দশতলা উঁচু এই বাড়িটার গাড়ি-বারান্দার তলায় অনেক লোক জমে গেছে। কি মহিলা কি পুরুষ সব্বাইকেই দেখি এই বৃষ্টির সময়টাকেই কি সুন্দর শান্তিপূর্ণ চিন্তাহীন সময় কাটায়। কাপড়চোপড় সামলেসুমলে এপাশ ওপাশ থেকে অফিস-ফেরতা আরও কিছু মানুষ ছুটে এসে কোনরকমে কংক্রিটের চালাও চালাটায় তলায় এসে মাথা বাঁচাতে চাইলো।

বৃষ্টির ছাট অনুযায়ী এদিক থেকে ওদিক নানান চাপে ভিড় সরছে।

বেরুতে আটকে গিয়ে মেজাজটা খারাপ হ'য়ে গেল। জরুরী এ্যাপয়েন্ট-মেন্ট হাওয়ায় খামোকা দু'একটা কথা ছুঁড়লুম। কি করবো. এখন কি করা যায়। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছিচকাঁদুনে আকাশটাকে দেখছি। এপাশে ওপাশে ঠ্যালা খাচ্ছি, খেতেতো হবেই, বিরক্ত হলেও কিচ্ছু বলার নেই. সব্বারই এক অবস্থা। ভাবছি—কি করবো। এখন আবার অফিসে উঠে গেলে মন্দ হয়না। অন্ততঃ নির্বিঘ্নে বসা যাবে, কিন্তু আবার সেই অফিস। আসলে অফিস সম্বন্ধে বরাবরই আমার একটা অ্যালার্জি আছে' কারন অফিস মানেই তো ফাইল, আর ফাইল বলতেই কাজ, আর কাজ মানেই অফিস। তা কাজ করি আর না করি, অফিসে থাকলেই মনে হয় আমাকে চারপাশ থেকে যেন কাজ ঘিরে ধরেছে। এই জন্যেই ছুটির দিনে পারতপক্ষে আর অফিস পাড়াতেই যাইনা। ষোল বছর কাজ করেও এ অভ্যেসটা পাল্টায়নি। অথচ এমনও নয় যে, অফিস থেকে বেড়িয়েই একটা জরুরী কিছু করবো, কিংবা এমনও নয় যে, সিনেমা থিয়েটার বা অনুষ্ঠানের

টিকিটফিকিট কাটা আছে, না গেলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে। তবু অফিস থেকে বেরুতেই হবে ঐ সাড়ে পাঁচটায়। তা জল ঝড় তুফান যাই ঘটে যাক, বেরুতে আমাকে হবেই। অন্তত এই ব্যাপারে অফিসের ঘড়িটা আমাকে দারুণ নিয়মানুবর্তিতা শিখিয়েছে, তবু এ মুহূর্তে অফিসটাকেই ভালো লাগলো। ভাবলুম—আবার উঠে গেলে মন্দ হয় না। তাছাড়া চলতি সপ্তাহের সাপ্তাহিকটি অ্যাটাচিতে রেখেছি, পেঙ্গুইনের দু-একটা বইপত্তরও আছে, সময় কাটাতে অসুবিধে হবে না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আরও একটু ভাবলুম। আমার আবার সব ব্যাপারেই সিদ্ধান্ত নিতে একটু দেরী হয়। এরকম দোনামনা ক'রে শেষপর্যন্ত ভাবলুম আর কিছু হোক বা নাহোক, বৃষ্টি না থামা পর্যন্ত একটা সহজ সরল নিরবিচ্ছিন্ন বিশেষ করে একটা ভিড়হীন জায়গায় সময় কাটিয়ে দেওয়া যাবে।

এই ভিড় ঠেলতে গিয়েই বকুলের সঙ্গে দেখা।

[বকুল, বকুল তুমি বকুল ! আশ্চর্য বকুলের সঙ্গে দেখা হয়েছে একথা ভাবতেই অবাক লাগছে।]

দেখা হয়েছে বললে ভুল হবে, যেন ফ্রিজ-শটের মতো চোখা-চোখি হল। হঠাৎ বাবলু ডাক শুনে ঘাবড়ে গিয়েছিলুম। এ পাড়ায় আমার পোষাকী নাম অতনু রায়। এছাড়া অন্য কোন নাম থাকতে পারে তা প্রায় ভুলেই মেরে দিয়েছি। হঠাৎ আটপৌরে এই ডাক শুনে মাথা এদিক ওদিক ঘোরাতেই চোখে পড়লো বকুলকে। শুধু আমিই নয়, মেয়েছেলের গলা পেয়ে প্রায় সবকটা চোখ ওর শরীরে গিয়ে আটকে গেছে প্রথমটায় আমি ওকে চিনতে পারিনি, চেনার কথাও নয়।

পুরনো পাড়াটা ছেড়ে সেই কবে চলে এসেছি। তা প্রায় তেরো-চোদ্দো বছর হলে চললো, বাঙুরে বাবা বাড়ি করার পর সেখানকার পাট চুকে গেছে। প্রথম দিকে একটুআধটু যাতায়াত থাকলেও দিন কয় পরেই পাতানো মাসীপিসি সম্পর্কগুলো ক্রমশঃই থিতিয়ে গেছে। পুরোনো বন্ধুবান্ধব, ঘনিষ্ঠ পাড়ার কাছের লোকেরা দূরে সরে গেছে,

দূর কাছে এসেছে, কত অজানা নাম অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছে। তবু কি সব স্মৃতি উপড়ে ফেলা যায় ? সব গন্ধ কি হওয়ায় মিলিয়ে যায় ? যেমন বকুল ?

আসলে সুধাংশু, অমলেশ, বিমল আর রাজা—এদের কথা মনে পড়ে, মনে পড়ে বকুলকে ঘিরেই। কারণ আমরা সবাই চাইতুম বকুল আমার কাছে আর একটু থাকুক। শুধু বকুল বকুল বকুল। আমি ওর জন্যে কবিতা লিখতুম, কলেজের নোটের পাশে লেখা থাকতো বকুলের নাম—বকুলমালা। বকুল থেকে বৈকালিক, বকুল ফুল। ছাপাটাপা কোথাও হ'তনা। দরকারও নেই লোকের জানার, যার জন্যে লিখেছি সে জানলেই হ'ল। সুধাতো মিলনী ক্লাবের সঙ্গে ফুটবল ম্যাচে হিরো হ'তে প্রাণপণ গোল দিতে গিয়ে একমাস পায়ে প্লাষ্টার বেঁধে বিছানায় শুয়েছিলো। আর বেচারা বিমল, ভোর চারটেয় উঠে হেঁড়ে গলায় বাড়ির লোকের ঘুম ভাঙাতো। ওর বাবা ছিলেন জর্জ্জ কোর্টের মোক্তার। একদিন রাত জেগে কাজকম্মো করে ভদ্রলোক ঘুমুচ্ছিলেন, শেষরাতে বিমলের গলা সাধার রেওয়াজে কাঁচাঘুম ভেঙে যেতেই ভদ্রলোক খড়ম ছুঁড়ে মেরেছিলেন। তবু বিমল ঐ গলায় চলতি গানগুলো মক্‌সো করতো শুধুমাত্র বকুলকেই শোনাবে ব'লে। তখন আমাদের একমাত্র যৌবনের উপর, বার্ধক্যের বারাণসী বকুল, আমাদের বকুলমালা।

তবু বকুলকে আমরা পাইনি, বকুল কাছে এসেছে আরও কাছে আসেনি। আমাদের মনের কথা মনেই রয়ে গেছে। একবার তো ও আমাদের সব্বাইকে ধরে ধরে ভাইফোঁটা দিয়ে দিল, দিল না শুধু রাজাকে : বড়লোকের ছেলে—রাজা, সবদিক থেকে চৌখশ। কলেজে, টেবিলটেনিশে, ব্যাডমিন্টনে, ক্রিকেটে, পড়াশুনোয়। রাজাই শেষ-বাঁকে এসে বাজি মেরে দিল। রাজা গল্প করতো, বকুলকে নিয়ে কবে ইডেনগার্ডেনে গেছে, লেকে বেড়াবার পর ফিসফ্রাই খেয়েছে, কবে সিনেমা দেখেছে। আমরা দাঁতে-দাঁত চেপে শুনতুম, বুকের মধ্যে কেমন যেন যন্ত্রণাবোধ হোতো। আমরা বিশ্বাস করতুম ওর কথা, কারণ বকুলও কখনও সে বিশ্বাস ভেঙে দিতোনা। আমরা রাজাকে গালাগাল দিয়েছি, শাপশাপান্ত করেছি, কিন্তু বকুলকে কিচ্ছু

বলিনি। ও যদি কষ্ট পায় তাহলে আমরা দুঃখ পাবো। আমরা পরস্পর একজোট হয়ে কাঁধেকাঁধ, বুকে বুক দিয়ে নিজেদের যন্ত্রণা আঁকড়ে রেখে তারপর একসময় এদিক ওদিক ছিটকে পড়েছিলুম। জানিনা সে আজ কতোদিনের কথা। আজ জুলপির আশে-পাশে মাথা বরাবর কাঁচাপাকা চুলে সেই স্মৃতি আবছা মনে হয়। বিমলের সঙ্গে মাঝে মধ্যে দেখা হয়। ও একটা বিলিতি ওষুধ কোম্পানির সিনিয়ার সেলস-রিপ্রেজেনটেটিভ। মেদিনীপুর ওর এরিয়া। মোটাসোটা ভুঁড়ি হয়েছে, পেটের তলায় ট্রাউজার্স পরতে হয়। সুধাংশু সরকারি অফিসের বড়বাবু। মাথায় বেশ খানিকটা জায়গা পরিষ্কার হয়ে চকচক করছে। অফিস-ফেরতা শেয়ালদার আশেপাশে ফুটপাথের থেকে বাজার সেরে ও লোকাল ট্রেন ধরে। বিমল কনট্রাকটারি করছে। একদিন গানের কথা বলতে গিয়ে ও হেসে ফেলেছিলো। ওদের সঙ্গে দেখা হয় না! দেখা হওয়ার কথাও নয়। তবু এতোদিন বাদে বকুলকে চিনে নিতে আমার একটুও দেরী হ'ল না। বকুল আমাদের বকুল! বললুম—তুমি? এখানে? গলার স্বর আলজিভে এসে আটকে গেল। গলাটা ঝেড়ে একটু স্পষ্ট করে বললুম—এখানে কোথায় এসেছিলে? কথাগুলো নিজের কানেই বেসুরো ব'লে মনে হল।

এই এইখানে। বকুল হাসলো। বকুল হাসলে গালে টোল পড়তো, আজও সেই টোল পড়ছে। যে চোখদুটো দেখার জন্যে আমরা পাগল হয়ে যেতুম, সেই চোখ, সেই ভুরু, সেই বকুল চোখে একটা মোটা কালো ফ্রেমের চশমা। বকুলের চেহারাটা কি আরও শুকনো হয়েছে। তুমি চশমা কবে নিলে বকুল? তোমার চোখ তোমার ভুরু তোমার তুমি। অথচ তুমি কোথায় বকুল? কিছুই বলা হ'ল না। বললুম—তুমি কিন্তু ভীষণ রোগা হয়ে গ্যাছো। বকুল হাসলো। বকুল হাসলে শরীরে ঢেউ ওঠে। আশ্চর্য, আজও ঠিক আগের দিনের মতো বকুল তেমনি হেসে বললো—শরীরের আর দোষ কি বল, বয়সতো কম হল না। বললুম—কত আর হবে? বকুল নিঃশব্দে হেসে প্রসঙ্গ পাল্টিয়ে বলল—বাঙুরেই আছোতো? মাথা হেলালুম?

এর চেয়ে বেশী আর কথা হল না! দেখলুম—আমাদের

ধারেকাছের প্রায় সব লোকরাই আমাদের কথা হাঁ করে গিলছে। আমাদের থামতে হল। শুধু বৃষ্টিটুকু ধরার অপেক্ষায় রইলুম।

এখন বৃষ্টি পড়ছে।

আমি আর বকুল। বকুল আমার কত কাছে ওর চুলের গন্ধ, ওর গায়ের তাপ, ওর বুকের এত কাছাকাছি। মনে হচ্ছিল বৃষ্টিভেজা চড়ুইয়ের মতো বিকেলের খোড়ো-চালায় হৃদয়ের তাপে উষ্ণ হচ্ছে আমাদের বকুল, আমার বকুলবালা।)

বৃষ্টিটা একটু ধরে এলো। এখন শুধু ঝিরঝিরে তুষার যেন মাথার চুলে রেণু রেণু হয়ে জমছে। ভিড় কমতে শুরু করছে, এবার বেরুনো যায়। বকুলকে আসতে বললাম—চলো না, কোথাও একটু বসে চা খাওয়া যাক। বকুল আর না করল না। হাঁটতে হাঁটতে বৃষ্টি থেমে থেমে গেল। এসপ্লানেডের সব দোকানে ভিড়। বকুল বললো—এত ভিড়ে জায়গা পাওয়া যায়? বললুম—পাওয়া যায়। বকুল, যারা জায়গা চায়, তারা এই ভিড়েই জায়গা ক'রে নেয়। বকুল সরাসরি চোখে চোখ রাখলো। উত্তর পেলুম না।

ভাগ্য ভালো। একটা টেবিল পাওয়া গেল। বললুম—দেখলেতো বকুল, জায়গাটা ছোট হলেও বসতে'তো পেলুম! বকুল কথা না বলে খুট্ করে ব্যাগ থেকে রুমাল বের করে কানের লতি, গলা মুছলো, মাথায় অল্প করে ছুঁইয়ে ব্যাগে রেখে কাপড়ের আঁচলটা ঠিক করতে করতে বললো—সব্বাই বসার ভাগ্য করে আসে না। কাউকে আবার বৃষ্টি মাথায় ক'রে ফিরেওতো যেতে হয়। বললুম—হয়তো তা হয়, তবে বকুল ধরো তারাতো আরও উজ্জল ঘেরাটোপ ডিভানে গা ডুবিয়ে বসে থাকতে পারে। কেউ কেউ মধ্যবিত্ত ভিড়ের মুখোমুখি হতে চায় না, ধরো, তাদের সহ্য হয় না।

—ঠিক বলেছো বাবলু—

তবে ঘেরাটোপ ডিভানেভই কি সকলে বসবার ভাগ্য নিয়ে আসে?

আমি বকুলের দিকে তাকালুম।

—এখনো কবিতা লেখো ?

মনে হল কোথায় যেন এক কোনো ছন্দপতন ঘটেছে। আমাদের ফেলে আসা পথের গভীরে যাওয়ার অভীপ্সায় মন উন্মুখ। আমি আর্তনাদ করে উঠলুম। আমার সমস্ত শিরায় গভীর যন্ত্রণা। বললুম —রাজা কোথায় বকুল ?

সে তো রাজা, বাবলু। বকুল বকুল। তাকে বাড়িইর উঠোনে কিংবা বাগানবাড়িতেই ভালো মানায়। সে'তো আর গোলাপ নয়, যে সরাসরি ফুলদানীতে গিয়ে উঠবে। বললুম—আমি বুঝতে পারছি না বকুল—রাজা, মানে আমাদের, মানে তোমার রাজা কোথায় ? রাজা ? সেতো এখন কানাডায়। শুনেছি, ওখানেই সেটেলড্ করেছে। শুনেছি বিরাট চাকরী, বিরাট প্রসপেক্টস। কথার উপরেই আমি প্রায় চেঁচিয়ে উঠে বললাম। আর তুমি ? তুমি কি ?

আমি ? বকুল হাসলো। চাকরী বাকরী নিয়ে এই তো বেশ চলে যাচ্ছে। যাকৃগে। বলো তোমার গিন্নী কেমন আছে ? ছেলেমেয়েরা ? বকুল অস্বস্তিকর সহজ হয়ে উঠলো—ওরা ভালো আছে ?

মাথা নাড়লুম। মানে ভালো আছে।

—আবার কবে দেখা হবে ?

কি লাভ।

বকুল রাস্তা পার হল।

আলো অন্ধকারে রাস্তার সব গাছকেই মনে হল বকুল। সব ফুল-কেই মনে হল বকুল। সব রাস্তাকেই মনে হল আমাদের ফেলে আসা পথ।

ছায়া ছায়া অন্ধকারে শ্যাওলারঙের শাড়িটা রাস্তার ওপারে মিশে মিশে গেল।

বুকের খাঁজে কি না পাওয়ার বেদনা, শূন্যতা

আর এক ঈশ্বর

কলিংবেলে আঙুলের চাপ দেবার আগে সুজাতা আরেকবার ভাবলো। ভরদুপুরের হয়তো ভদ্রলোক ঘুমুচ্ছেন, কিংবা হয়তো ঘরেই নেই। ঠিকানাটা ততক্ষণে হাতের মুঠোয় ঘেমে উঠেছে। রাস্তার পিচগলা হাওয়ায় জলঢালা উনুনের ভাপ।

সুজাতা ভাবলো, যদি উনি চিনতে না পারেন? তাহলে কিন্তু বড্ডো লজ্জার ব্যাপার হবে। সুজাতার মতো মেয়েকে—চেনার···অবশ্য সুজাতার মতো মেয়েকে ওঁর মনে রাখার কথাও নয়, বিশেষ ক'রে অরিন্দম সান্যালের মতো লোকের নয়ই। অত বড় একজন সাহিত্যিক, তুচ্ছ বাস্তবের সীমা পেরিয়ে যিনি আরেক জগতের অধীশ্বর, যাঁর বাগানে আলোর ফুল ফোটে, স্বপ্নের রাত গড়িয়ে ভোর হয়, যার সম্মোহন সুরে পাঠক সাপের মতো দোলে। শুধু ওঁর লেখাপত্তর নয়, অরিন্দম সান্যালকে নিয়েই আজকাল বাজারে কত গল্প। তিনি কেমন ক'রে পাদপ্রদীপের আলোয় এসেছেন, কতো বেদনায় তাঁকে চলতি পথের রসদ খুঁজে নিতে হয়েছে, হাজারো চড়াই উৎরাই পেরিয়ে তিনি কেমন ক'রে স্বপ্নলোকের চাবির ছড়া হাতে তুলে নিয়েছেন, সে সব কাহিনী শুনতে শুনতে পাঠকেরও রোমাঞ্চ জাগে।

কোন্ এক দুর্বার আকর্ষণে সুজাতা এখানে এসেছে তা ব'লে বোঝানো যাবে না। সূত্র এত সামান্য তা ধ'রে এত দূর আসা যায় না, মনে রাখার মততো নয়ই। সেবার কলেজের সেক্রেট্যরীর কলকাতার এক বিশেষ বন্ধুর অনুরোধে সুজাতাদের বার্ষিক সাহিত্যসভায় অরিন্দম সান্যাল শেষপর্যন্ত প্রধান অতিথি হতে রাজী হয়েছিলেন। তা না হ'লে নলহাটির মতো জায়গায় তাঁর মতো লোকের আসার কথা ভাবা যায় না। সাহিত্য প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ ছাত্রীদের হাতে পুরস্কার তুলে দিয়ে অরিন্দমবাবু অনেক কথা বলেছিলেন। তা সেরকম কথাতো

অনেকেই বলেন, আবার চলে যান সুজাতা দেখে দরজা খুলে বললো—

অনেকেটা পরে দরজা খুলে এক ভদ্রমহিলা এলেন। আচ্ছা, আপনি বসুন—আমি উপরে খবর দিচ্ছি। ভদ্রমহিলা পরিচয় না দিলেও সুজাতার মনে হল, ইনি নিশ্চয়ই অরিন্দমবাবুর স্ত্রী।

বাইরে তখনও রোদের হল্‌কা। ঘরে' দরজা জানালা প্রায় বন্ধ বাইরের হাওয়া পর্দার তলা দিয়ে আর কতটা আসে। ফ্যানটা ঘুরলে খানিকটা ঠাণ্ডা হওয়া যেতো। কিন্তু যাবার সময় উনি সুইচটা অন করে দিয়ে যাননি। সুজাতার ঘাড়ে পিঠে বগলে ঘাম জমতে সুরু করেছে। আঁচল দিয়ে কানের লতি ঘাড়, কপাল আলগা করে মুছে সোফার একধারে ও জড়সড়ো হ'য়ে বসলো। ঘরটা বেশ ছিমছাম ক্যাবিনেটে সৌখিন আলমারীতে দেশবিদেশের ঠাসা বই পরিপাটি করে সাজানো। দু'একটা পুতুল, মাদুরের টুকরোয় বেশ দেয়াল জুড়ে ছবির মেলা। কোনটিতে অরিন্দমবাবু একা, কোনোটা বা রাজপুরুষের সঙ্গে কোনোটা হয়তো সহসা মুখে পুরস্কার গ্রহণ করেন।

সুজাতার ব্লাউজটা ক্রমশই ভিজে বিশ্রী হয়ে যাচ্ছে। উঠে গিয়ে সুইচটা অন করে দিলে ভাল হ'ত, কিন্তু ইচ্ছে করল না। যদি হঠাৎ অরিন্দমবাবু এসে পড়েন, হয়তো অসভ্যতা হবে। ভ্যাপ্‌সা গরমে সুজাতা ভিজতে লাগল।

ঠিক সময় পর্দা ঠেলে ঢুকলেন শালপ্রাংশু অরিন্দম সান্যাল, পেছনে তাঁর স্ত্রী। ভদ্রমহিলা, এবার ফ্যানটা খুলে দিতে সুজাতার শরীরটা যেন জুড়িয়ে গেল। সুজাতার মনে হ'ল অরিন্দমবাবুর সঙ্গে তার দরকারের ব্যাপারে ভদ্রমহিলারও আগ্রহও কম নয়। সুজাতা খাতাটাতাগুলো নিয়েই ধড়মড় করে উঠে ঘাড় নুইয়ে নমস্কার করে বলল—আমায় চিনতে পারছেন ? আমার নাম সুজাতা, মানে সুজাতা মিত্র : সেই যে গত বছরে নলহাটিতে আমাদের কলেজে গিয়েছিলেন, আমাদের প্রাইজ দিয়েছিলেন ?

—ইয়েস ইয়েস, নিশ্চয়ই মনে পড়েছে, বসুন, বসুন। আরে আপনিইতো প্রথম পুরস্কার পেয়েছিলেন। জানো প্রতিমা, সেই যে সেবার বীরভূমে গিয়েছিলাম? নলহাটিতে? সেখানেই এদের সঙ্গে আলাপ। আমি কিন্তু তোমাকে তুমি বলেই বলছি। সুজাতা লজ্জা পাচ্ছে। ঘাড় নাড়ে। তা কি করে বাড়ি চিনলে? অসুবিধে হয়নি তো? ঠিকানা পেলে কোথায়? চেহারাটাও তোমার একটু পাল্টেছে, প্রথমে চিনতেই পারিনি। তুমি কি এখন ওখান থেকেই আসছো? সুজাতা মৃদুস্বরে বলে—ভেবেছিলাম, আপনি বুঝি আমাকে চিনতেই পারবেন না।

চিনতে পারবো না মানে? জানো তো, অরিন্দমবাবু কপালে টোকা মারতে মারতে বলেন, আমাদের সব ব্যাপার—এই এখানে, বুঝেছো, এখানে, আটকে রাখতে হয়। জানো প্রতিমা—এর লেখার খুউব ভাল হাত। ওদের ম্যাগাজীনে ওর একটা গল্প পড়েছো। আমি রীতিমতো অবাক হয়েছিলাম। লেখা সুরু করেই তুমি যেরকম মুন্সীয়ানা দেখিয়েছো তাতে সত্যিই অবাক হবার মতো। তা এখনো লিখছোটিকছো তো? আচ্ছা সে সব পরে হবে, তুমি কি খাবে, চা না কফি? সুজাতা আস্তে বলল—চা। সুজাতার খিদেয় পেট জ্বলছিলো। সেই কখন সামান্য কিছু মুখে গুঁজে চলে এসেছে। এখন ক'টা হলো। ঘরে ঘড়ি ছিল না। সুজাতার মনে হল প্রায় তিনটে।

ভদ্রমহিলা অরিন্দমবাবুর এত উৎসাহে খুশি হননি। সুজাতাও এতটা আশা করেনি। সুজাতার খুব ভাল লাগছিলো। কোথাকার এক গণ্ডগ্রাম কলেজের সাহিত্য-প্রতিযোগিতায় প্রাইজ পাওয়া একটা গেঁয়ো মেয়েকে এত বড় একজন মানুষ যে এমন গুরুত্ব দেবে, ও এতটা আশা করেনি। সুজাতা নিজেকে সবার থেকে আলাদা করে ভাবছিলো। অঞ্জলি, লিলি, সবিতা সবার থেকে অনেক অনেক আলাদা। আসলে ওরা বিশ্বাসই করবে না সুজাতা অরিন্দম সান্যালের এত কাছে থেকে এত কথা বলতে পারছে। সুজাতা সাহিত্যের কতটুকুইবা কাছে আসতে পেরেছে। পোড়ো-মাটির ঘরে সংসারের হাড়ভাঙা পরিশ্রমের

পর কলেজের পড়া শেষ করে কাগজের তাপ্পিমার। ভাঙা হ্যারিকেনের আলোয় সে যখন কিছু লেখার চেষ্টা করে তখন সংসারের দৈন্য, ছোট ভাইবোনদের অসহায় মুখের চেহারা ছাড়া একটা বাড়তি কথা কলমে আসে না। শূন্য দৃষ্টিতে চল্‌টা-ওঠা কালো দেয়ালের দিকে তাকাতে তাকাতে মাথায় যখন ঝিম ধরে, ভাঙা হ্যারিকেনের কাঁচ কালো হতে হতে যখন অন্ধকার হ'য়ে আসে, তখনই হয়তো কিছু দুঃখের সংলাপ-গুলো জড়ো হয়। তাই থেকে একটা লেখা গুছিয়ে মেজদায় সুজাতা কলেজের সাহিত্যে প্রতিযোগিতায় দিয়েছিলো। কিন্তু সেটা যে হঠাৎ এতটা সম্মান পেয়ে যাবে সে আশা করেনি। গল্পটা ছাপাও হয়েছিল মুখ-পত্রে। এ গল্পটা অরিন্দমবাবুর এত ভালো লাগবে এ কথা কল্পনাতেও আসেনি। আর এই শুভেচ্ছাই সুজাতাকে অনেক দিয়েছে। সুজাতা তারপর একটার পর একটা খেলায় পাতা ভ'রে তুলেছে।

তাই অত দূর থেকে সুজাতা লেখাগুলোকে বুকে আঁকড়ে এনেছে ঠিক জননীর মতো। অরিন্দমবাবুকে এর থেকে আরও কিছু শোনাবে, তারপর ওঁর যদি আরো ভাল লাগে, লেখাগুলো যদি ছাপাবার ব্যবস্থা-ট্যাবস্থা করা যায়; এমন একটা বিরাট স্বপ্ন যেন তার বুকের খাঁচায় পাখা ঝাপটাচ্ছে। হটাৎ কখন বাইরে এসে পড়বে।

অরিন্দমবাবু বললেন—খাতাগুলো কিসের ?

সুজাতার হাত-পা ঘামতে থাকে। ও যেন আরও জবুথবু হ'য়ে পড়ে, কাপড়ে আড়াল করা খাতাগুলো আর একটু পাশে ঠেলে দেয়।

অরিন্দমবাবু বলেন—জানো, লেখাটেখা হল একটা সাধনা। কোন আইডিয়া মাথায় এলেই যে তাকে ঝপাঝপ গল্প উপন্যাস করতে হবে এর কোনো মানে নেই, তাকে মাথায় রাখতে হয়; তারপর আমের মঞ্জুরী থেকে সব বউল ঝরে গিয়ে দেখবে—কিছু আছে, তারপর তাতে রঙ ধরবে, তারপরে তো হবে—রসাল। আর পূর্ণতা পাওয়া যাকে বল, আমি তাকে বলি অসীম। সে পূর্ণতা পাওয়া আমাদের কারোপক্ষেই সম্ভব নয়। আরও সম্ভাবনার জন্যেই সব সময়ই এগিয়ে যাওয়া মানে—চরৈবেতি। আর ভালো লাগা ? ছাখো সুজাতা—ভালো, আরও

ভালো, তার থেকেও ভালো সে শুধু আমারা সন্ধানই করে যাই। তাই মাঝে মাঝে ফুলের বাগান দেখতে গিয়ে প্রচণ্ড আক্রোশে যখন ফুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করে, ধরো, এটা আমাদের না পাবার জন্যেই এই আক্রোশ। শিল্পের ধর্মই হ'ল তাই, আসলে গল্পকারকে আগে শিল্পী হতে হয়। রঙে রঙে বোনা ছবিটাকে আরো রঙ বুলিয়ে যেন আশ মেটে না। এই যে ধরো তুমি, তোমার সৌন্দর্য শুধু দেহে নয়, এই তোমার পোশাকআশাক, বসার ভঙ্গীমা, পরিবেশ সব কিছু মিলিয়েই হল হল তুমি, কাউকে বাদ দিয়েই কাউকে ভাবা সম্ভব নয়।

সুজাতা লজ্জা পায়। হঠাৎ পড়ে যাওয়া আঁচলটা তুলে বুকে গুছিয়ে নেয়।

সুজাতার ভালো লাগে। অরিন্দমবাবু এত ভালো ভালো কথা বলতে পারেন। হঠাৎ ভদ্রমহিলা এসে দরজা-জানালা খুলে পর্দাগুলো সরিয়ে দিলেন। অরিন্দমবাবু খানিকক্ষণ থেমে দু' হাতের চেটো এপাশ-ওপাশ করতে থাকেন। সুজাতাও কিছু বলতে গিয়ে হঠাৎ যেন থেমে যায়। ভদ্রমহিলা যতক্ষণ ছিলেন ততক্ষণ খানিক চুপচাপ, সুজাতার দিকে একপলক চেয়ে ভদ্রমহিলা আবার ভেতরে চলে গেলেন। পর্দাটা নড়েচড়ে থেমে যেতেই অরিন্দমবাবু বললেন—তোমাদের জায়গাটা কিন্তু ভারি রোম্যান্টিক, অপূর্ব জায়গা। সুজাতা ঘেমে যাচ্ছে। অরিন্দমবাবু যে কথাগুলো বলছিলেন সেগুলো সুজাতার জন্যেই যেন একান্ত। কতকাল সুজাতা এ সব কথা শোনার জন্যে অপেক্ষা করেছে। তারপর অতি সন্তর্পণে সে তার এতদিনের সঞ্চিত সাধনা তার ঈশ্বরকে অঞ্জলি দেবে। সুজাতা সেই পরম মুহূর্তের অপেক্ষায় ছিল। হয়তো অরিন্দমবাবুই তার কাজ থেকে সস্নেহে তুলে নেবেন প্রতিদিনের দুঃখের পদাবলী।

ট্রেতে চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে বাচ্চা একটা কাজের ছেলে ঢুকলো, সঙ্গে ঢুকলেন—ভদ্রমহিলা। সেই এক ভঙ্গীমায়—

: ক' চামচ চিনি দেবো ভাই।

ঃ আপনার যা ইচ্ছে।

প্রতিমা দেবী নিরুত্তাপ আতিথেয়তা করলেন। সাহিত্যের নিপুণ শিল্পী দোর্দণ্ডপ্রতাপ অরিন্দম সান্যালও স্বাভাবিক হতে গিয়ে যেন কেমন যেন অস্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছেন। কিছুক্ষণ আগের এই বাঁধভাঙা জোয়ারের মতো কথার স্রোত কেমন যেন অতল জলে খে হারিয়ে ঘুরে ঘুরে কোথায় যেন তলিয়ে যাচ্ছে।

সুজাতার মনে হ'ল—সব কিছু ভাললাগা, পরম রমণীয়তাও প্রকাশ্যে মেনে নেওয়াতেও মানুষের গোপনে থাকে। নিষেধের বেড়া ডিঙিয়ে আমরা কেউ পার হতে চাইনা, হয়তো পারিওনা, কিন্তু কেউ না পারুক ঈশ্বরতো পারেন। জীবন-শিল্পী, সেতো আরেক ঈশ্বর, যে ঈশ্বরের সন্ধানে সুজাতা দীর্ঘপথ পেরিয়ে এখানে ছুটে এসেছে।

তাই ঈশ্বর যখন সাধারণ মানুষ হ'য়ে করুণার পাত্র হন, তখনই স্বপ্নের পাহাড় ধ্বসে পড়ে। প্রচণ্ড শিলীভূত স্রোতে সমস্ত স্থিতি যেন ভেসে যায়।

সুজাতার সমস্ত শিরা উপশিরায় যেন লাভাস্রোত বইতে থাকে। রুক্ষ জমিনে জেগে থাকে রোদ জ্বলা খড়। সুজাতার মনে হ'ল—জীবন আরো গভীর। আরও কোনো গভীরতম বেদনার সরোবর, যার জলে তাকে রোজ ডুবতে হয়। যে সরোবরে শালুক নেই, পদ্ম নেই, শুধু জলের অতল অন্ধকার, অসংলগ্ন জালিতে জড়িয়ে থাকা অন্তহীন পাড়। সেখানে পা জড়িয়ে সুজাতা যদি ডুবে যায় তার আর্তনাদ এ পাড়ে এসে কখনো পৌঁছবেনা। তার বেদনার অরণ্যে ভোর হলেও আলো আসেনা। সুজাতা কতটুকুই বা বলতে পেরেছে যা কিছু বলতে যাওয়া তাতো গভীর যন্ত্রণার কতোখানি? অংশ বই তো নয়, তাই হয়তো যেভাবে বলা হয় সুজাতাব সেভাবে কোনদিনই বলা হবে না। বলা হয়তো হ'য়ে ওঠেনি, তবু অক্ষরগুলো তার সন্তানের মতো, তাকে আগলে রাখাই আরেক সান্ত্বনা। সে-তো একান্ত নিজস্ব।

আর অরিন্দম বাবু। নাঃ সুজাতার কি ভীষণভাবে বোঝা হয়ে

গেছে, এই কলমে হৃদয়ের কথা নিপুণ ভাবে বলা আছে শিল্পীর মতো কিন্তু বুকের খাঁজে কি বিরাট শূন্যতা কি নাপাওয়ার বেদনা! এই অন্তহীন শূন্যতা নিয়ে পথ চলা। বানানো আকাশে আবছা রঙের মানুষ তৈরী ক'রে কলের পুতুলের মতো কথা বলানো এই পৃথিবীতে সত্যি-কারের কোন শালুক ফোটেনা। জ্যোৎস্না গলে গলে মাটি চুঁইয়ে পড়ে না। অথচ কত কষ্ট ক'রে নিপুণ ছাঁদে সবকিছু গড়তে হয়। নাঃ এই মেকী হিসেবের সঙ্গে সুজাতার কোন মিল নেই।

সংসারে হাড়ভাঙা খাটুনীর পর হ্যারিকেনের শিস-ওঠা কাঁচে তাকে তৃতীয় নয়ন মেলে রাখতে হয়। যেখানে তার সবকটা দরজা খোলা থাকে। সেখানে পাখি গান গায়। ফুলে ফলে বসন্ত আসে, তখনতো সে আরেক রাজ্যের রানী।

সুজাতা খাতাগুলো বুকে চেপে ধরে।

এর মধ্যে ফোন এলো। ফোন ধরেই উনি ডায়েরীর পাতা উল্টোলেন, অ্যাপয়ন্টমেন্ট হ'ল। ডাইরীতে নোট করলেন। আবার নীরবতা কিছুক্ষণ। ফোন বেজে উঠলো, এবার বিরক্তিতে দু'চার কথায় শেষ করলেন। এবার সুজাতার খাতাগুলোর দিকে তাকিয়ে বললেন—নতুন লেখা এনেছো বুঝি? এত ঝামেলায় থাকতে হয়না, সারা বছরে লেখার আর শেষ নেই। বিশেষ সংখ্যার পর বিশেষ সংখ্যা। পত্রিকাও বেরুচ্ছে তেমনি। কোথা থেকে যে সবার এত টাকা আসে কে জানে। সবই সুন্দর, তার মধ্যে ট্যাক্সের ঝামেলা, পাবলিশারের তাগাদা, ফোন অর্ধেক দিন খারাপ, তবু বিল উঠে যাচ্ছে। সত্যিই পারা যায় না। অথচ ছাখো, তেমন তেমন ভাবে লেখার উপায় নেই, পাঠক ছাড়বে না, নাঃ, মাঝে মাঝে মনে হয় সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে কোথাও নিশ্চিন্ত হয়ে বিশ্রাম নিই।

সুজাতা মনে মনে হাসে। অরিন্দমবাবুরা এমনিভাবেই পেরে যাবেন। না পেরে উপায় নেই।

পর্দার নীচে শাড়ির পাড় দেখে প্রিয় লেখক প্রসঙ্গ পাল্টালেন।

নিপুণভাবে আবার চা এলো। সঙ্গে কিছু খাবার। সুজাতার কিচ্ছু দাঁতে কাটতে ইচ্ছে হ'ল না। কোথাও যেন একটা বিশাল দেওয়াল উঠে গেছে। ক্রমশঃই আড়াল হ'য়ে যাচ্ছেন অরিন্দম বাবু।

—খেয়ে নাও সুজাতা। ভাজাভুজি ঠাণ্ডা হয়ে গেলে ভালো লাগবে না। সমস্তই তোমার বৌদির হাতে তৈরী। আমি আবার রান্না-বান্নার ব্যাপারে ঠাকুরচাকর পছন্দ করিনা। যদিও একজন আছে, তবে সে শুধু দায়সারাগোছের। আসলে কি জানো, লেখার মতো রান্না করাটাও আরেকটা আর্ট। এ সবাই রপ্ত করতে পারে না। এদিক দিয়ে তোমার বৌদি কিন্তু একজন পাকা আর্টিষ্ট, বিশেষ ক'রে ওর মাছের প্রিপারেশন ফ্যান্টাস্টিক···ভদ্রমহিলা কপট রাগে কথাগুলোকে থামিয়ে দিয়ে বললেন—আঃ তুমি কি থামবে ?

সুজাতার একটুও ভালো লাগছিল না। সুন্দর কাঁচগুলো ক্রমশঃই চির খেয়ে যাচ্ছে। এ অরিন্দমবাবু, কোন অরিন্দম রায় ? খুব সাধারণ ঘরোয়া আর ভীতু। যে ঈশ্বরকে সে কল্পনা করে এসে, সে-তো সেভাবেই থাকলে ভালো হত। আরেক ঈশ্বর এসে কেন তাকে এভাবে টুকরো টুকরো করে দিচ্ছেন ?

আবার সেই স্বর।

—ক' চামচ চিনি দোবো ভাই।

যা ইচ্ছে।

যেভাবে অতিথেয়তা হয়, সেভাবেই হ'ল। সুজাতার সব কিছু স্বপ্ন আস্তে আস্তে ডুবন্ত মানুষ হয়ে তলিয়ে যাচ্ছে। সব কিছু ভালো লাগা, পরমরমনীয়তাকে প্রকাশ্যে মেনে নেওয়া যায় না ঠিকই। নিষেধের বেড়া ডিঙোই, পার হ'তে চাই না। কিন্তু কেউ না পারুক, ঈশ্বর তো পারেন। আরেক ঈশ্বরের স্বরূপ সন্ধানেই সুজাতা এই দীর্ঘপথ পেরিয়ে এখানে এসেছে।

সেই ঈশ্বর যখন একজন সাধারণ মানুষ। তিনি আর দশজনের মতো যখন করুণার পাত্র হন, তখন স্বপ্নের পাহাড় ধ্বসে পড়ে। শিলীভূত স্রোতে সমস্ত সৃষ্টি স্থিতি লয় যেন ভেসে যায়।

সুজাতার শরীরের শিরা উপশিরায় দপদপে স্রোত বইতে থাকে, সুজাতার আর একদম ভালোলাগছিল না, চায়ের কাপ প্রায় এক চুমুকেই শেষ ক'রে উঠে দাঁড়ায়।

প্রণাম ক'রে আসা হল না, ভুলে। রাস্তায় নেমে মনে হ'ল, হয়তো ভুল হ'য়ে গেল।

যাক্।

খবরের কাগজে মোড়া হৃদয় নিয়ে ও সম্রাজ্ঞী হ'য়ে ও পথে নামে।

ক'লকাতা বিক্রি হ'য়ে যাচ্ছে

একটি অসমাপ্ত চিত্রনাট্য

স্টেশনে নেমে হাঁটতে হবে। কিন্তু বড় রাস্তা দিয়ে যদি মাঠটায় নামা যায়, তাহলে ঘরের মধ্যে ঘরের পাশ দিয়ে কাঁচা-রাস্তায় নেমে যদি, বাঁকটার সামনে এসে দাঁড়ানো যায়, তাহলে-গজিয়ে ওঠা কলোনীটার প্রথমেই এই উঠোনটা চোখে পড়বে। মাঝেমধ্যে গায়ের জোরেই যেন পাকা বাড়ি,। দু'একটি দোতলা হ'তে হ'তে থেমে রয়েছে, মানে পরে হবে। নাঃ, 'অতদূর আর যেতে হবে না। এখান থেকেই মুলিবাঁশের দুটো ঘরের একপাশে রান্নাঘরটা চোখে পড়বে। সামনের উঠোনে পাঁচমিশেলি গাছের মধ্যে মেশানো ফুলফোটা গাছ। জানলায় যে মেয়েটি চুলে রবার জড়িয়ে এক মনে পড়ে যাচ্ছে, তাকেও একটু লক্ষ্য করলে স্থির দেখা যাবে।

ক্যামেরা এখানে ব'সলে তার ফটোজেনিক-ফেস আসবে কিনা জানিনা, তবে ঈশ্বর তাকে অঢেল যৌবন দিয়েছেন বোঝা যাবে। রান্নাঘরে ভাজবার শব্দ না পাওয়া গেলেও ওখানে যে একজন আছেন তা ঠাহর হবে—তার রান্নাঘর আর ঘরে ঢোকা-বেরুনোর চলাফেরা দেখে। তাহলে বুঝবেন তিনি এ বাড়ির গৃহিনী। ডিটেইলস এ না গিয়ে এখান থেকেই তা ঠিকই বোঝা যাবে। এখন আমরা ফিরে যাচ্ছি। অন্য জায়গায়।

বনগাঁ, বারাসত, সোদপুর, দত্তপুকুর থেকে ট্রেনভর্তি ছেলেমেয়েরা আসে, শেয়ালদায়, আবার ফিরে যায়। একমাত্র ছাত্রছাত্রী ডেলি-প্যাসেঞ্জারদের বোঝা গেলেও বাকীরা যে কলকাতায় কেন যাচ্ছেন, আবার ভর্তি হ'য়ে ফিরে আসছেন, তা বোঝা যাবেনা, সম্ভবও নয়।

এবার আমরা ফিরে যাই দত্ত সাহেবের অফিসে। এখন অফিস ছুটি। ছুটির পরেও দত্ত সাহেবকে থাকতে হয়। তিনি নীলুবাবু অর্থাৎ নীলকান্ত সামন্তের খোঁজ করছেন কিন্তু সামন্তের জুতো ঢাকা

করিডরে ঘরবার পায়চারী করছেন্ কেন? ফ্রিজ-শট নিলে তার মুখে চিন্তাটা ধরা পড়তো।

আর ভাবনা?

—নাঃ এর আগে কক্ষনো এমনটি হয়নি। এবং হওয়ার কথাও নয়, আজ তো নতুন ব্যাপার নয়, আর এই হওয়া বা না হওয়ার মধ্যে অন্তত আজকে যে কতটা নির্ভর করছে তা যদি ঈশ্বরচন্দ্র কলোনীর নীলকান্ত জানতো। জানবেনা কেন, জানেতো সবই। কোম্পানি, এর জন্যে খাতায়-পত্তরে না হলেও মাসকাবারি বেশ কিছুতো ধরে দেয়, তাই বা কম কি? এটা কি চাকরীর পর্যায়ে পড়েনা! এ-ভাইতো চলে আসছে, তানাহলে নীলবাবুর সংসার টিকে আছে কেমন করে?

এখন—দত্ত সাহেবকে সামনে রেখেই গল্প শুরু করা যাক্। দত্ত সাহেব নার্ভাস হ'য়ে পড়লে ফুশফুশ ক'রে ঘনঘন সিগ্রেটে টান দেন, দেন বটে, তবে একে খাওয়া বলে না। দামী ব্র্যাণ্ড। সুজন দত্তের পকেটে এ ব্র্যাণ্ড না থাকলে কম্পানিতে মানায়না। দত্ত সাহেবের ষ্ট্যাটাস, মানে কোম্পানির ষ্ট্যাটাস। সোনার বাঙলায় দত্ত সাহেব থাকেন না, থাকেন কোম্পানির খাস ক'লকাতার ফ্ল্যাটে। খাস-কলকাতা—ক্রমশঃই বিক্রি হয়ে যাচ্ছে, সাহেব তা যা জানেন—তার চেয়ে বেশী জানেন এই কোম্পানির মালিক শেঠ বনোয়ারীলাল।

খাস চেম্বারে শেঠের বাবার একটা ছবি টাঙানো আছে। তিন ঘরের মাপের এয়ারকণ্ডিশন চেম্বার। নাঃ, সেই পুরনো লোহা বেচাকেনার চেহারাটাই অছে। বনোয়ারীল তাকে সোনা দিয়ে বাধিয়েছেন। ফুলে-ফেঁপে উঠছে কোম্পানি। দুটো চা-বাগান আর যা আছে, তা দত্ত সাহেবই জানেন। এখন অফিসের সামনে দাঁড়ানো দুটো গাড়ি একটা দিশী, একটা বিদেশী এয়ারকণ্ডিশনড্। দত্ত সাহেবের গাড়ি উনি নিজেই ড্রাইভ করেন।

দত্ত সাহেব স্মার্ট, নিখুঁত টাইয়ের নট, কোর্টপ্যাণ্টের ভাঁজে কোনা ত্রুটি নেই। দত্ত সাহেব বনোয়ারীলালের এক নম্বর লোক। তাকে চৌখস ক'রে রাখার জন্যে কোম্পানি পয়সা দেয়।

সেই দত্ত সাহেবের কপালে ঘাম, অস্থির বারবার করিডোর পেরিয়ে দূরের গেটের দিকে চাইছেন' সেখানে দারোয়ানের ঘরে আলো জ্বলছে, দারোয়ানকে গেটটা ফাঁক করে রাখতে হবে, দারোয়ান জানে, তবু আরেকবার মনে করিয়ে দিয়ে এলো দত্ত সাহেব ? যা উনি করেন না।

দত্ত সাহেবের সিগ্রেটটা মুখের এপাশ থেকে ওপাশে সরে যাচ্ছে। এসব দেখেই মনে হবে দত্ত সাহেব এভাবে বোধ হয় কখনো ভাবেন নি। অবশ্য আর একজন ভাবছেন, এয়ারকণ্ডিশন চেম্বারে বসে শেঠ বনোয়ারীলালজী, তার ভাবনা অন্য, দত্ত সাহেবের জন্যে নয়। যার কাজ সেই করবে, এ নিয়ে তার ভাবনার কোনো কারন নেই। তিনি নিরামিষ খান, তার কপালে লাগানো চন্দনের টিপ এখনো একটুও মোছেনি। তার আসল বাড়ি, মানে এখনো মকান থেকে আসল ঘি আসে। ঘরে পাঁপড় তৈরী হয়। আসল দুধ টিনভর্তি ক'রে চলে আসে খুব সকালে। একদিন সুজন দত্ত কাজে গিয়ে দেখে শেঠজী কাট গেলাসে সবুজ পানীয় খাচ্ছেন, সেটা করলার রস। নেশা একটাই আছে, শেঠের তা হ'ল পানবাহারের' ডিব্বা খুলে মাঝে মাঝে মুখে ছিটিয়ে দেন। বাইরের সবাই তাই জানে।

খুব মিষ্টি শব্দ করে চেম্বারের বাইরে শেঠজীর লাল-আলো হঠাৎ জ্বলে উঠলো, মানে—দত্ত সাহেব।

আর দত্ত সাহেব মানে জয়রাম ইনডাস্ট্রির মালিকের সামনে আজকের সমস্যা। দত্ত সাহেবের ঘর না পেরিয়ে মালিকের চেম্বারে ঢোকা প্রায় অসম্ভব। চেম্বার নয়, একা বলা যায় স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট। ফ্রিজ আছে, সোডা থেকে শুরু ক'রে দামী স্কচ আছে, গ্যাস আছে, শেঠজীর নিজস্ব বেয়ারা হরিরাম আছে। মাঝে মাঝে শেঠজীর বিশেষ বিশেষের জন্যে কিছু বানিয়ে দিতে হয়, অতিথিকে আপ্যায়িত করতে। সুজন দত্ত ছাড়া এসব জানে একমাত্র খাস বেয়ারা হরিরাম।

নাঃ আবার বেল বাজলো। এবারে আর হরিরামকে আসতে হোলো না। দত্ত সাহেব নিজেই ছুটে গেলেন। নিজেই চীৎকার করে বললেন—রাস্‌কেল। শাহ্‌লা, আজ আমি যদি ডুবি তাহলে তোমার

ঘর জ্বালিয়ে দেবো। নীলবাবুর মতো লাইনের ঘাগু লোক আজ ডোবাবে? নাঃ, এ হ'তে পারেনা কিন্তু দেরীতো কক্ষনো হয় না, বিশেষ ক'রে আজকের মতো দিনে। কালকের ফ্লাইটেই মিঃ চাকলাদার দিল্লী চলে যাবেন। এত বড় একটা এক্সপোর্টের ব্যাপার। চালু করতে পারলে কোম্পানির ঘরে লাখ লাখ টাকা আসবে। চাকলাদের শুধু টাকা নয়, আরো অনেক কিছু চাই। তিনি সময় পান না, আজ পেয়েছেন। এই সুবল দত্তই তাকে রাজী করিয়েছেন। যে ক'জন বাঙালীকে সাহেবরা সাহেব করে রেখে গেছেন, চাকলাদার তাঁদের একজন। ঘড়ির কাঁটায় চলেন। আজকের অতিথি। আজ কাজের কথা নয়, বিনোদনের কথা। রিলাক্‌শেসন।

আসছে সপ্তাহে টেণ্ডার ওপেন হবে। ওরে নীলু, আমি কি পাগল হ'য়ে যাবো। শালা, তোদের গুষ্টির সব কটা হাড় পাঁজরা বিক্রি করেও এর ধারেকাছে পৌঁছোনো যাবে না। সব কথা পাকা। আজকে চাকলাদার খুশী হ'লে কোম্পানি যে অর্ডার পাবে তার একশো এক ভাগ গ্যারান্টি। দত্ত সাহেব এ গ্যারান্টি দিতে পারে, শেঠজীও জানে।

ওফ্‌, গড্‌, এবার পার করে দাও মা কালী। তারপর? তারপর আমি নীলুকে দেখাচ্ছি। আমিও একটা ইডিয়েট, সকালবেলা ওর বাড়িটা একবার ঘুরে এলেই হোতো। আর যাবো কি, গাড়িও তো ঢোকে না। আধ মাইল রাস্তা হাঁটো। আচ্ছা, এখন এসব কথা ভাবতে হচ্ছে কেন?

না না। নীলবাবু নিশ্চয়ই আসবে। কখনো তো ফেল করেনি। ট্যাক্সির ভাড়া বেড়েছে ব'লে নিশ্চয়ই মোড় পর্যন্ত বাসে আসবে। তারপর ট্যাক্সি। তা পয়সা বাঁচাবার দরকারটা কি? ট্যাক্সির ভাড়া কি আলাদা ক'রে দেওয়া হয় না?

চেম্বার থেকে আবার বেলের আওয়াজ। টিং টং। বেল তো নয় যেন নীলবাবুর বুকে কেউ হাতুড়ি মারছে।

শেঠজী ভাবছেন।

আমি যে এখন কি করি। সবে সিগ্রেটটা ধরিয়েছিলেন দত্ত। তাকে একটানে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চেম্বারে ঢুকে আবার দেয়ালে ধাক্কা খাওয়া টেনিশ বলের মতো বেরিয়ে এলেন।

ঘড়িতে ছটা পঁয়তাল্লিশ, মানে পোনে সাত। চাকলাদার আসবেন সাতটায়। ঠিক সাতটাতেই। হরিরাম আর বেরুচ্ছে না, তার কাজ শুরু হয়ে গেছে। দত্ত সাহেবের চোখ ফেটে জল আসতে চাইলো। নীলবাবু তুমি কোথায়? তুমি বেঁচে আছো তো? অন্ততঃ তোমার মরার খবরটা পেলে আমি অন্ততঃ বেঁচে যাই। বিশ্বাস করো নীলুবাবু আমিও তোমার মতো চাকরি করি। এই লম্বা চওড়া চেহারাটার তলায় আরেক সুজন দত্ত আছে। সে-ও চায়না এভাবে কিছু পেতে। কিন্তু কে আমাকে এত টাকা দেবে। গাড়ি দেবে? ক্লাবের মেম্বার ক'রে দেবে? ষ্ট্যাটাসটা বাড়ানো যায়, তাকে ফিরিয়ে দেওয়া যায় না। আমার ছেলে মেয়ে নামী ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ে, আমার স্ত্রী মহিলা ক্লাবের মেম্বার আমি শেঠজীর সেক্রেটারী। আমাকে সব দিক কি ক'রে সামলাতে হয়, তা কি তুমি জানো না? তুমি আমায় দয়া কর। এখন তুমি আমার ভগবান।

দূরে গাড়ির হেডলাইট। হ্যাঁ সাতটা বাজে। রিষ্টওয়াচ ঠিক চলছে। সাতটা বেজে দু' এক মিনিট পারও হয়েছে। গাড়িটা ঢুকলো। ঢোকবার আগেই ভরত গেট খুলে দিয়েছে। করিডোর দিয়ে সুজন দত্ত অভিনন্দন জানিয়ে প্রায় গার্ড অফ অনারের ভঙ্গীতেই শেঠজীর চেম্বারের সাউণ্ড-প্রুফ দরজাটা খুলে দিলেন। শেঠজী দাঁড়িয়ে সহাস্যে পরের ঘরে নিয়ে গেলেন। যাবার আগে আড়চোখে একবার দত্তের তাকালেন। দরজাটা আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে গেল।

হরিরামের এখন ব্যস্ততা বাড়বে। ফ্রিজ থেকে সোডা। পাশের ওয়াড্রোব থেকে দামী পানীয়, গেলাসে ঢালা। কনটেনারের আইসকিউব ঢোকানো, কাজুবাদাম বোনলেস-চিকেন টেবিলে সাজবে। দেয়াল সেঁটে সোফাকামবেড হালকা লেদার ফোমে তৈরী। ওর ওপর এখন সুন্দর কাজ করা বেডকভার প'ড়ে গেছে।

শেঠজী একটু সময়ের জন্যে নিজেই বাইরে এলেন। এসেই সামনে দত্ত।

সব কুছু ঠিক আছে দত্ত?

স্যরি স্যার নীলবাবু এখনো এসে পৌছায়নি।

শাটআপ্। একইবাত, নীলুবাবু নীলুবাবু। রূপেয়া ছুঁড়ে মারলে হাজার নীলুবাবু লাইন লাগিয়ে দেবে। সাড়ে আট বাজে মাল পাঠাবেন। চাকলাদার সাব বহুৎ খতরনক আদমী। সব কাম কাজ ফয়েসলা আজই করিয়ে নিতে হবে। নীলবাবু বিলুবাবু কি এ বারিমে ফ্যাক্‌টর আছে? প্লিজ কুইক্, ফিনিশ দা ম্যাটার।

আপনি যান স্যার, আমি দেখছি এলো কিনা।

তুমি কি দেখবে হে সুজন দত্ত? তুমি কি এখন আর একটা নীলবাবুকে জোগাড় করতে পারবে? মাথার ওপর প্রথম লটে আড়াই-লাখ টাকার অর্ডার ঝুলছে। খসে পড়লে, এই টাই ফাই থাকবে? এই শীতের রাতে হাড়ের সঙ্গে চামড়ায় মিশে থাকা নীলবাবুর কলোনীতে হ্যারিকেনগুলো কি এখনো কি জ্বলছে? খুঁজে আনতে পারবে সুজন দত্ত? এরকম হেভি কাজে তোমার ইলিয়াস, বা মাখন সমাদ্দারকে বলে রাখলে পারতে? তিন জায়গায় অর্ডার বুক করলে তোমায় আজ এতটা ভাবতে হোতো না। চুলটা মুঠো করে মাথাটা একবার ঝাঁকালো দত্ত সাহেব।

সুজন দত্তর ডাক এখন পড়বে না।

নিস্তব্ধতর হ'য়ে এলো শহরপ্রান্তের আশপাশ। করিডরে দাঁড়ানো ছাড়া এখন উপায় নেই, এখন উদাস চোখে ভারী গেটের দিকে তাকিয়ে সুজন দত্ত তার ভবিষ্যত ভাবছিলেন।

ঠিক এই সময় দূরের অস্পষ্ট ছায়া ছায়া শরীর। কে? কে-এ? নিজের অজান্তেই স্বগতোক্তি, মুখ থেকে বেরিয়ে এলো। হ্যাঁ-নিশ্চয়ই কেউ। পায়ে-পায়ে গেট পেরিয়ে ঢুকে ছায়ার শরীরটা স্পষ্টতর হ'ল। ভরতই পথ দেখিয়ে নিয়ে আসছে। কিন্তু নীলুবাবু কোথায়? জাহান্নামে যাক্ শালা।

নাঃ এরকম চেহারার কেউ কখনো আসেনি, নিষ্পাপ দুটো চোখ অপলক। সাজসজ্জার কোনো বাহুল্যতা নেই।

আপনি ?

একটা চিরকুট এগিয়ে এলো। হ্যাঁ এটাই এই কোম্পানির ঠিকানা। আসুন আসুন। কিন্তু সুজন দত্তর মতো সাহেবের কেমন যেন অসহায় মনে হ'ল। যারা আসে এ এদের কেউ নয়। আস্তে আস্তে চেম্বারে ঢুকলো শান্ত একটা হরিণের মতো শরীর। একটু বাদেই একটা গন্ধ-শার্দুল তাকে ছিঁড়ে খাবে। ইচ্ছে করছিল না, কিন্তু এখন কোনো উপায় নেই। দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

সাড়ে আটটার সময় চাকলাদারের গাড়ি বেরিয়ে গেল সাহেবের মতো টলতে টলতে গেটের বাইরে।

উদভ্রান্ত অগোছাল বিপর্যস্ত প্রতিমা পায়ে পায়ে সুজন দত্তের সামনে এলো। হাতে গোছা নোট, অন্যদিনের তুলনায় অনেক বেশী। এগিয়ে দিতেই কিশোরী অপলক তাকালো সুজন দত্তের মুখের দিকে, তারপর আলতো গলায় বললো—বাবার—ধুম-জ্বর, দু'দিন বিছানা ছেড়ে উঠতে পারছেন, না। ভুল বকছেন। আর আপনাদের কোম্পানির নাম ক'রে এই কার্ডটার কথা বলছিলেন। স্পষ্ট আলোয় সুজন দত্ত চেয়ে দেখলো—তারই এনগ্রেভিং করা ভিজিটিং কার্ডে জ্বল জ্বল করছে কোম্পানির সঙ্গে তার নাম।
